# ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র

## অষ্টম শ্রেণী

# ভারতের সংবিধান

## ভাগ 4 ক

## মৌলিক কর্তব্য

**অনুচ্ছেদ 51 ক**

**মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-**

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বত হলে সাড়া দিতে হবে ;

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে ;

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস-২১১৬/(প্র.ক্র.৪৩/১৬) এসডী-৪ তারিখ ২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ ২৯.৪.২০২২ এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক সন ২০২২-২৩ এই শৈক্ষণিক বর্ষ থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে ।

# ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র

## অষ্টম শ্রেণী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পূণে ।

H5B1X7

আপনার স্মার্টফোনে DIKSHA APP দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার QR Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক-শ্রাব্য সাহিত্য উপলব্ধ হবে ।

First Edition : 2022

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল পুণে ৪১১০০৪

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন পর্ষদের কাছে এই পুস্তকের সর্ব অধিকার থাকবে। পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডলের সঞ্চালক এনার লিখিত অনুমতি ছাড়া প্রকাশিত করা যাবে না।


## ইতিহাস বিষয় সমিতি

ডা. সদানন্দ মোরে, অধ্যক্ষ
শ্রী মোহন শেটে, সদস্য
শ্রী পান্ডুরঙ্গ বলকবড়ে, সদস্য
ডা. শুভঙ্গনা অত্রে, সদস্য
ডা. সোমনাথ রোডে, সদস্য
শ্রী বাপুসাহেব শিন্দে, সদস্য
শ্রী বালকৃষ্ণ চোপড়ে, সদস্য
শ্রী প্রশান্ত সরুডকর, সদস্য
শ্রী মোগল জাধব, সদস্য-সচিব

## নাগরিকশাস্ত্র বিষয় সমিতি

ডা. শ্রীকান্ত পরংজপে, অধ্যক্ষ
প্রা. সাধনা কুলকর্ণী, সদস্য
ডা. প্রকাশ পওয়ার, সদস্য
প্রা. অজিংক্য গায়কবাড়, সদস্য
প্রা. সঙ্গিতা আহের, সদস্য
ডা. মোহন কাশীকর, সদস্য
শ্রী বৈজনাথ কালে, সদস্য
শ্রী মোগল জাধব, সদস্য-সচিব

## ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র অভ্যাসগট

শ্রী রাহুল প্রভু
শ্রী সঞ্জয় বাজরেকর
শ্রী সুভাষ রাঠোর
সৌ. সুনিতা দড়বী
ডা. শিবানী লিময়ে
শ্রী ভাওসাহেব উমাটে
ডা. নাগনাথ এওলে
শ্রী সদানন্দ ডোঙ্গরে
শ্রী রবীন্দ্র পাটীল
সৌ. রুপালী গিরকর
ডা. মিনাক্ষী উপাধ্যায়
ডা. রাওসাহেব শেড়কে
ডা. সতীশ চাপলে
শ্রী বিশাল কুলকর্ণী
প্রা শেখর পাটীল
শ্রী রামদাস ঠাকর
ডা. অজিত আপটে
ডা. মোহন খড়সে
সৌ. শিওকন্যা কদেরকর
শ্রী গৌতম ডাংগে
ডা. ব্যংকটেশ খরাত
শ্রী রবিন্দ্র শিন্দে
ডা. প্রভাকর লোন্ডে
ডা. মঞ্জিরী ভালেরাও
প্রা. শশি নিঘোজকর

## সংযোজন

শ্রী মোগল জাধব
বিশেষাধিকারী, ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র
সৌ. বর্ষা সরোদে
সহায়ক বিশেষাধিকারী, ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র
পাঠ্যপুস্তক মন্ডল, পুণে

## লেখন গট

শ্রী রাহুল প্রভু
শ্রী ভাওসাহেব উমাটে
শ্রী সঞ্জয় বাজরেকর
প্রা. শিবানী লিময়ে
শ্রী প্রশান্ত সরুডকর
প্রা. সাধনা কুলকর্ণী

**ভাষান্তরকার :** শ্রী অশিমকুমার অনিল বিশ্বাস
শ্রী মহাদেব অতুল ডে

**সমীক্ষক :** শ্রী অমর বিমল বিশ্বাস
শ্রী জগদীশ গোবিন্দ মল্লিক

**বিষয়তজ্ঞ :** শ্রী নারায়ণ দেবেন্দ্র মল্লিক
শ্রী বিজয় নির্মল মল্লিক

**ভাষান্তর সংযোজন :** ডা. অলকা পোতদার, বিশেষাধিকারী, হিন্দী
**সংয়োজন সহায়ক :** সৌ. সন্ধ্যা বি.উপাসনী, সহায়ক বিশেষাধিকারী, হিন্দী

**মুখপৃষ্ঠ ও সাজ :** শ্রী দিলিপ কদম
**মানচিত্রকার :** শ্রী রবিকিরন জাধব
**অক্ষর বিন্যাস :** সমর্থ গ্রাফিক্স্, ৫২২ নারায়ণ পেঠ, পুণে ৩০.
**কাগজ :** ৭০ জী.এস.এম.ক্রিমবোহ
**মুদ্রনাদেশ :** N/PB/2022-23/ Qty.- 1,000
**মুদ্রক :** M/s. Uchitha Graphics Printers Pvt. Ltd., Navi Mumbai

## নির্মিতি

শ্রী সচিন মেহতা,
মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী শশাঙ্ক কণিকদড়ে
নির্মিতি অধিকারী

## প্রকাশক

**শ্রী বিবেক উত্তম গোসাবী**
নিয়ন্ত্রক,
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মন্ডল,
প্রভাদেবী, মুম্বই - ২৫.

# ভারতের সংবিধান

## উদ্দেশিকা

‘‘আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।’’

## রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

## প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ ।সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

# প্রস্তাবনা

প্রিয় ছাত্রছাত্রী বৃন্দ,

তোমরা তৃতীয় শ্রেনী থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র বিষয়ের অধ্যয়ন পরিসর-অভ্যাস রূপে করেছ। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অভ্যাসক্রমে ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র স্বতন্ত্র বিষয় দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এই দুটি বিষয়ের সমাবেশ একটি পাঠ্যপুস্তকে করা হয়েছে। মরাঠী ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের নির্মিতি বর্ষ ২০১৮ তে করা হয়েছিল। বাংলা ভাষিক ছাত্র-ছাত্রীদের আবশ্যকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অষ্টম শ্রেনীর জন্য বাংলা ভাষায় ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকটি প্রথম আবৃত্তি করা হলো। প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ অনুভব হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তকের রচনা করার উদ্দেশ্য, বিষয় ঠিকভাবে বুঝতে পারা, বিষয়বস্তু আকর্ষনীয় হওয়া এবং আমাদের পূর্বপুরুষের কার্য থেকে অনুপ্রেরনা পাবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নে জ্ঞানের সাথে-সাথে তোমাদের অধ্যয়ন অর্থপূর্ণ হবে ইহা আমরা আশা করছি। এই জন্য পাঠ্যপুস্তকে রঙিন ছবি ও মানচিত্র দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি পাঠ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য পূর্বক অধ্যয়ন করা উচিৎ। তার মধ্যে যে অংশটি তুমি বুঝতে না পারবে তাহা শিক্ষক বা অভিভাবকের কাছ থেকে বুঝে নেবে। প্রদত্ত ছকে লেখা অক্ষরগুলি তোমার জিজ্ঞাসা বা কৌতুহল বৃদ্ধি করবে। তোমরা যদি অধিক বেশী জানতে চাও তাহলে অ্যাপের মাধ্যমে (QR Code) দ্বারা প্রত্যেক পাঠের সম্বন্ধে উপযুক্ত দৃশ্য-শ্রাব্য (অডিও, ভিডিও) ভিজ্যুয়াল উপদানগুলি উপলব্ধ হবে। এটি অধ্যয়নের জন্য অবশ্যই উপযুক্ত হবে। ইতিহাস এই বিষয়টি কে আকর্ষনীয় করার চেষ্টা করেছি। তাই এই বিষয়টি তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে।

ইতিহাস বিভাগে 'আধুনিক ভারতের ইতিহাস' দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের নতুন ধারা এবং শিক্ষার জাতীয় মূলনীতি (গাভাঘটক), অধ্যয়ন নিস্পত্তি এর সমন্বয়ে পাঠ্যপুস্তকটি লেখা হয়েছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে স্বতন্ত্রতা, সমতা, বন্ধুতা ও ন্যায় বিচার এই তন্ত্রবিধানের অভিব্যাক্ত কিভাবে, হয়েছে তা এই পাঠ্য পুস্তকের অধ্যয়নে স্পষ্ট বা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক ভারতের ইতিহাস সাধন সাহিত্যের পরিচয় করে দেয়। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য কিভাবে বিস্তৃত হয়েছে তাহা দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অধিকার থেকে ভারতীয়দের স্বাধীন করার জন্য ভারতবর্ষের জনগন অবিস্মরনীয় সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ বলিদানের বর্ণনা ইতিহাস বিভাগে দেওয়া হয়েছে।

নাগরিকশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সংসদীয় শাসন পদ্ধতীর পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা সংবিধানের আইন নিয়ম বিধি দ্বারা পরিচালিত করা হয় তার বিবরন বলা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে ভারতের সংসদ, কেন্দ্রীয় কার্যকারিতা পর্ষদ, ভারতের ন্যায়ব্যবস্থা, রাজ্যপ্রশাসন আমলাতান্ত্রিক সংরচনা ও সমাজের সকল গনতান্ত্রিকীকরন প্রক্রিয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পুণে

তারিখ : ২ এপ্রিল ২০২২

ভারতীয় সৌর : ১২ চৈত্র ১৯৪৪

**(কৃষ্ণকুমার পাটীল)**

সঞ্চালক

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও

অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে

# শিক্ষকের জন্য

ষষ্ঠ শ্রেনী এবং সপ্তম শ্রেনীর পাঠ্যক্রমে আমরা ক্রমাগত প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছি। অষ্টমশ্রেনীর ইতিহাসে ভারতবর্ষে উপধিবেশিকরন এবং উপনিবেশকরনের প্রক্রিয়া এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলন অন্তর্ভূক্ত ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে আদর্শ প্রেরনা, ভারতে জাতীয়বাদের উত্থান এবং বিকাস, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করলে তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধও রাষ্ট্র অভিমান বাড়িয়ে তোলবে।

ইতিহাস বিজ্ঞানধিষ্ঠিত অধ্যয়ন বিষয়। তাতে ইতিহাসের সাহিত্য সাধনের অসাধারন গুরুত্ব রয়েছে। কালানুরুপনুসার ইতিহাসের সাধন সাহিত্যের স্বরুপ লক্ষ্য রেখে প্রথম বিভাগে ইতিহাসের সাধনের সমাবেশ করা হয়েছে। ইউরোপের পুন জাগৃতির সময় ও বিপ্লবীযুগের ফলে সাম্রাজ্যবাদের বৃদ্ধি হয়ে এশিয়া আফ্রিকা মহাদ্বীপে উপনিবেশীকরনের প্রক্রিয়া বৃদ্ধি হয়েছিল। ভারতে ও পশ্চিম সাম্রাজ্যবাদী উচ্চকাঙক্ষার শিকার হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের ভারতের উপর কি পরিনাম হয়েছিল। সময়ের সাথে-সাথে ভারতের জনগনের মধ্যে অস্মিতা জাগৃতী হয়ে স্বাধীনতার প্রেরনা পায়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যাপন করার সময় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের স্থাপনা, নরম এবং গরম দলের কাল খন্ডে রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের কার্য, গান্ধীযুগে সত্যাগ্রহের মার্গ অবলম্বন করে আন্দোলন করেছেন সশাস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আজাদ হিন্দ সেনার যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের মুক্তি, ফ্রান্স এবং পুর্তগাল উপনিবেশকদের হাত থেকে মুক্তি এরুপ ঘটনার তথ্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দৃশ্য শ্রাব্য সাধনের মাধ্যমে (ছায়াছবি, তথ্যের চিত্রপট, অনুবোধপট, ধ্বনীফিত ইত্যাদি) ক্ষেত্র পরিদর্শন, আর্কাইভ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক অগ্রগতি বিবেচনা করার সময় ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতার ধারনা ভারতীয়দের মধ্যে কিভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছিল। তাহা ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করে দেওয়া যাবে। ভারতের ইতিহাসের পটভুমি অধ্যয়নের সময় মহারাষ্ট্র রাজ্য নির্মানের অগ্রগতি ও সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের চিন্তাধারা আমাদের করতে হবে।

সপ্তম শ্রেনীর নাগরিকশাস্ত্র বিভাগে আমরা সংবিধানে ব্যক্ত হওয়া দর্শন জ্ঞান, মূল্যবোধ অধ্যয়ন করেছি। অষ্টমশ্রেনীর নাগরিকশাস্ত্রের বিভাগে সংবিধান দ্বারা নির্মিতী করা প্রশাসন পদ্ধতী প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা তন্ত্র এবং বিচার ব্যবস্থা পদ্ধতীতে কার্য করা হয়। উপস্থাপিত বিষয় বস্তু সমকালিন উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা সংবিধানে তত্ত্ব জ্ঞানের এবং প্রতিফলিত হওয়া মূল্যবোধের সাথে আদর্শ স্থাপিত করা।

সংবিধান একটি প্রবাহিত দলিলপত্র এর দ্বারা গনতন্ত্র ও আইনের অধিরাজ্য প্রাত্যক্ষিকভাবে সফল করা হয়েছে। ইহা ছাত্র-ছাত্রীদের বোধ করিয়ে দেবে। এর দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা সামাজিক ও আর্থিক সমন্ধে অধিক সচেতন সক্ষম হতে সাহায্য পাবে। ফলস্বরুপ অধ্যয়নার্থীদের গনতন্ত্রিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্ধ খোঁজ করতে সম্ভব হবে। পাঠ্য বইতে নির্ধারিত পাঠাংশের উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা। সমুহে আলোচনা পরিকল্পনা, প্রকল্প, গ্রাফিতি এবং এই একটি বিষয়ের মধ্যে অনেক রাজনৈতিক দৃষ্টিভক্তি বুঝতে পারবে। এই ধরনের উপক্রম ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পূর্ণ করিয়ে নিতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের রচনা করার সময় জ্ঞানরচনাবাদ শিক্ষা এবং কৃতিযুক্ত অধ্যাপনকে বিশেষ মহত্ব দেওয়া হয়েছে। এই জন্য অধ্যয়নার্থীদের পাঠ্য ঘটকের বিষয়ে অধিক ও মনোরঞ্জক করার জন্য পাঠের ভেতরে ছক (চৌকোন) দেওয়া হয়েছে। তার সাথে সাথে চলো আলোচনা করি, করে দেখ, এর দ্বারা অধ্যয়নার্থীরা অধ্যয়ন ক্রিয়া করার জন্য সক্রিয় থাকবে এর বিচার করা হয়েছে। ছাত্রদের কৃতিশীলতা, বিচারশক্তি, এবং স্বমতামত ব্যক্ত করার দৃষ্টিকোন রেখে স্বাধ্যায় ও উপক্রমের রচনা করা হয়েছে। পাঠের বিষয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান দেওয়ার জন্য QR Code এর সমাবেশ পাঠ্যপুস্তকে করা হয়েছে। এর ব্যবহার করে আমাদের উৎকৃষ্ট অধ্যাপন করতে সহজ হবে।

# ইতিহাস

## আধুনিক ভারতের ইতিহাস

### অনুক্রমণিকা


| অনু.ক্র. | পাঠের নাম | পৃষ্ঠ ক্রমাঙ্ক |
|---|---|---|
| ১. | ইতিহাসের সাধন ............................................. | ১ |
| ২. | ইউরোপ এবং ভারত ........................................... | ৫ |
| ৩. | ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিনাম ....................................... | ১০ |
| ৪. | ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম ............................ | ১৫ |
| ৫. | সামাজিক ও ধার্মিক পুনর্জাগরন ................................ | ২১ |
| ৬. | স্বাধীনতা আন্দোলন যুগের প্রারম্ভ .............................. | ২৫ |
| ৭. | অসহযোগ আন্দোলন ......................................... | ৩১ |
| ৮. | সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলন ................................. | ৩৬ |
| ৯. | স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্ব .................................. | ৪০ |
| ১০. | সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন .......................................... | ৪৫ |
| ১১. | সমতার লড়াই ................................................ | ৫০ |
| ১২. | স্বাধীনতা অর্জন ............................................... | ৫৬ |
| ১৩. | স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণতা ...................................... | ৫৯ |
| ১৪. | মহারাষ্ট্র রাজ্যের সৃষ্টি ............................................ | ৬২ |


**S.O.I. Note :** The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2018. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

# অধ্যয়ন নিস্পত্তি

| নির্দেশিত শিক্ষাগত প্রক্রিয়া | অধ্যয়ন নিস্পত্তি |
| --- | --- |
| **অধ্যয়নার্থীদেরকে অধ্যয়ন অনুভবের সুযোগ প্রদান করে উপযুক্ত সমূহে জোড়া/ বা ব্যক্তিগত ভাবে নিম্ন কার্যের জন্য উৎসাহিত করা।**<br>• ভারতবর্ষে রাজঅধিকারের পরাম্পরিক বংশগত দ্বন্দ্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পনী হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন কেন মনে করেছিল, এই রকম বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত করা।<br>• উপনিবেশিক প্রশাসনের কেন্দ্র ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি, এরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন রেখে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিদর্শন করা।<br>• গান্ধীজীর অহিংসার ধারনা ও ভারতের স্বাধীনতা / রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পরিনাম।<br>• ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি সময়সূচক দিগদর্শক করা।<br>• চৌরিচৌড়া ঘটনার উপর ভিত্তি করে ভূমিকা পালনের কার্যক্রম আয়োজন করা।<br>• উপনিবেশিক যুগে বেশী ফসল ফলানো ও বেশী ক্ষতি গ্রস্ত হওয়া অঞ্চল, ভারতের মানচিত্র দেখানো এরূপ প্রকল্প ও কৃতি। উপক্রম আয়োজন করা।<br>• তৎকালিন বিবিধ আন্দোলনের ইতিহাস বোঝার জন্য বা পূর্নরচনা করার জন্য দেশের এবং ব্রিটিশদের লেখা আত্মজীবনী, চরিত্র, উপন্যাস, চিত্র, ছায়াচিত্র, সমকালীন লেখা, দলিলপত্র, খবরের কাগজ প্রকাশিত লেখা, ছায়াছবির তথ্য এবং আধুনিক লেখন সাহিত্য যেমন সাধনের পরিচয় প্রাপ্ত করা।<br>• স্ব- মূল্যয়নের জন্য শিক্ষাদান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোনে নবনূতন উদ্ভাবনীও প্রনিত প্রশ্ন উপস্থাপন (যেমন পলাশীর যুদ্ধের কারন কি ছিল?) ইহা পরিচয় করে দেওয়া। | **ছাত্র-ছাত্রী**<br>08.73H.1 ইতিহসের বিভিন্ন সাহিত্য চিনতে পারে এবং আধুনিক সময়ের ইতিহাস পূনরায় লেখার জন্য তার ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করে।<br>08.73H.2 বিভিন্ন উৎস, বিভিন্ন প্রদেশের জন্য ব্যবহারে আনা নামকরন এবং ওই সময়ে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে আধুনিক যুগে, মধ্যযুগের কালখন্ডে এবং প্রাচীনযুগের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারে।<br>08.73H.3 ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানী সবচেয়ে অধিক বলশালী (শক্তিশালী) সাম্রাজ্যবাদী কি ভাবে হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে।<br>08.73H.4 বিভিন্ন প্রদেশের ব্রিটিশ কৃষি নীতির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বলতে পারে। যেমন নীলের উত্থান।<br>08.73H.5 উন্নিশবা (একবিংশ) শতাব্দীতে উপজাতীয় (আদিবাসী) সমাজের রচনা এবং তাদের পর্যাবরনের সাথে সম্পর্ক বর্ণনা করে।<br>08.73H.6 উপজাতীয় (আদিবাসী) সমাজের সম্প্রদায়িক সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রশাসনিক নীতিগুলি ব্যাখ্যা করে।<br>08.73H.7 ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভ, স্বরুপ এবং ব্যাপ্তি তাহা থেকে শেখা বোধ ব্যাখ্যা করে।<br>08.73H.8 ব্রিটিশকালিন সাম্রাজ্যে প্রাচীন নগর ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র এবং হস্তশিল্পের উপর ভিত্তি করে ব্যবসা বানিজ্য থেকে সরে এসে ব্রিটিশ শাসনকালে কি ভাবে নতুন নাগরিক বানিজ্য কেন্দ্র এবং শিল্পের বিকাশ হয়েছিল তা বিশ্লেষন করে।<br>08.73H.9 ভারতে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠা নিকরন হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে।<br>08.73H.10 জাতি বা বর্ণ ব্যবস্থা, মহিলাদের স্থান বিধবাদের পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সামাজিক সংস্কার এবং এই প্রশ্ন সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি ও আইন বিশ্লেষন করে।<br>08.73H.11 আধুনিক সময়ে শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতির প্রমুখ রুপরেখা বলতে পারে।<br>08.73H.12 ১৮৭০ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কালে প্রগতি যাত্রার পর্যালোচনা করে।<br>08.73H.13 রাষ্ট্রনির্মানের প্রক্রিয়ার মহত্বপূর্ন ঘটকের বিশ্লেষন করে। |

# ১. ইতিহাসের সাধন

আমরা প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাসের সাধন অধ্যয়ন করেছি। এই ‘বছর আমরা আধুনিক ভারতের ইতিহাস সাধন সাহিত্যের অধ্যয়ন করব। ইতিহাস সাধনের মধ্যে ভৌতিক লিখিত এবং মৌখিক সাধনের সমাবেশ হয়। তার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে দৃশ্য-শ্রাব্য এবং দৃশ্য-শ্রাব্য এই সাধন যন্ত্রগুলির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

**ভৌতিক সাধন :** ইতিহাসের ভৌতিক সাধনের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু, বাস্তুকলা, মূদ্রা, মূর্তি এবং পদক ইত্যাদি সাধনের সমাবেশ করা যেতে পারে।

**ভবন ও বাস্তুকলা :** আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক যুগের কানখন্ডে ইউরোপে বিশেষত ব্রিটিশ রাজত্ব অধিকার এবং রাজাদের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সময় মানা হয়। এই সময়ে বিভিন্ন মহল, ভবন, সেতু, রাস্তা, জলাশয় মন্ডপ এর মত বহু বাস্তু নির্মাণ করেছিল। এই ভবনের মধ্যে প্রশাসনিক কার্যালয়, কর্মকর্তা নেতা ও বিপ্লবীদের বাসস্থান রাজাদের রাজবাড়ী, দুর্গ, কারাগার এরুপ ভবনের সমাবেশ দেখা যায়। এই বাস্তুর মধ্যে অনেক বাস্তুকলা আজ ও ভাল অবস্থায় দেখা যায়। কিছু বাস্তু রাষ্ট্রীয় স্মৃতি শোধ হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে তবে কিছু ভবনে সংগ্রহালয় স্থাপন করা হয়েছে। যেমন : আন্দমানের সেল্যুলর জেল।

এসব বাস্তুকলা পারিদর্শন করার পর আমরা তৎকালিন ইতিহাস স্থাপত্যশাস্ত্র, বাস্তুর স্বরুপের উপর ওই সময়ের আর্থিক সমৃদ্ধির। বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। যেমন আন্দমানের সেল্যুলর জেল পরিদর্শন করলে স্বাধীনতাবীর সাওরকরের বিপ্লবী কার্য বিষয়ে বা মুম্বইয়ের মনীভবন কিংবা বর্ধা এখানের সেবাগ্রাম আশ্রম পরিদর্শন করলে, গান্ধীযুগের ইতিহাস বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

**তুমি জানো কি ?**

**বস্তু সংগ্রহালয় এবং ইতিহাস :** ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য বস্তু সংগ্রহালয় দ্বারা বিভিন্ন বস্তু, চিত্রকর্ম ছায়া চিত্র (ফটোগ্রাফের) মতো বিভিন্ন বস্তু সুরক্ষিত রেখেছিল। পূনের আগাখান প্যালেশ এখানের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ে (মেমোরিয়াল মিউজিয়াম) মহাত্মা গান্ধীর ব্যবহৃত অনেক বস্তু ও কাগজপত্র দেখতে পাওয়া যায়।

আগাখান প্যালেস, পূণে

**মূর্তি ও স্মৃতি স্তম্ভ :** স্বাধীনতার পূর্বে ও স্বাধীনতার পরের সময়ে অনেক ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভ মূর্তি রুপ স্থাপন করেছিল। আধুনিক ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য এই মূর্তিগুলির বিশেষ মহত্বপুর্ণ রয়েছে। বিভিন্ন মূর্তির ভিত্তিতে আমরা তৎকালিন শাসক, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। মূর্তির দর্শনী ভাগে অর্থাৎ নীচের বোর্ডে সম্বন্ধিত ব্যক্তির পূর্ণ নাম, জন্ম-মৃত্যুর উল্লেখ ওই ব্যক্তির কতৃককর্মের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, লোকমান্য টিলক, ডা. বাবাসাহেব আম্বেডকরের মূর্তির মতো বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপনা করেছে। স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে ঘটনা, ঘটনাকাল, ওই

ঘটনার সম্বন্ধিত ব্যক্তি জানকারী বলে। যেমন বিভিন্ন স্থানের শহীদ স্তম্ভ স্মারক।

**করে দেখো।**

তোমাদের নিকটের পরিবেশে স্মারক এবং মূর্তি এই বিষয়ে তথ্য জেনে নাও। সেই ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে কি তথ্য পাও তা একটি খাতায় নোট করো।

**লিখিত সাধন :** আধুনিক ভারতের ইতিহাসে লিখিত সাধনের মধ্যে নীচের বিষয়গুলি সমাবেশ হয়।

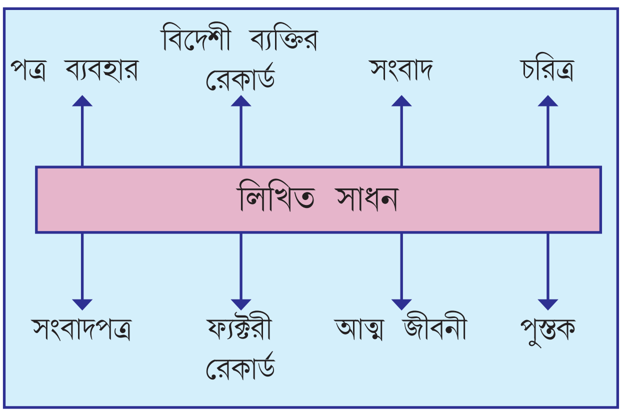


**সংবাদপত্র ও পত্রিকা :** সংবাদ পত্র থেকে আমরা সমকালীন ঘটনা বিষয়ে জানতে পারি। সেই সাথে-সাথে যে কোনো ঘটনার সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষন, বিশিষ্ট মান্যবরদের মতামত, অগ্রনী নিবন্ধ বিশ্লেষন হতে থাকে। ওই সময়ের রাজকীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের তথ্য পাই। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে জ্ঞানোদয়, জ্ঞান প্রকাশ, কেশরী, দীনবন্ধু, অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি সংবাদপত্র স্বাধীনতার পূর্বকালে জনসচেতনার গুরুত্বপূর্ন সাধন ছিলো। এই সংবাদপত্র গুলির মাধ্যমে আমরা ব্রিটিশশাসনকালে ভারতের বিষয় নীতি ভারতের উপর তার প্রভাবগুলি অধ্যয়ন করতে পারি। ব্রিটিশ আমলে সংবাদপত্র শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক জাগরনের সাধন হিসাবে কাজ করতো। বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুনকর ইনি 'নিবন্ধ মালা এই মাসিক পত্রিকায় কাজ করতেন। লোকহিতবাদী উর্ফ গোপাল হরি দেশমুখ 'প্রভাকর' সাপ্তাহিক থেকে শতপত্রের মাধ্যমে বিবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন।

**চলো জেনে নেবো...**

**ডাঁ.বাবাসাহেব আম্বেডকর এবং সংবাদ পত্র :** ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকর ১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে পাক্ষিক 'মূকনায়ক' শুরু করেছিলেন। 'কিন্তু তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলেন্ড গিয়েছিলেন সেই জন্য তিনি এই মাসিকপত্রের সম্পূর্ণ ভার তাঁর সহকর্মীর হাতে দিয়েছিলেন। ডাঁ. বাবাসাহেব আম্বেডকর এপ্রিল ১৯২৭ সালে 'বহিস্কৃত ভারত' মাসিক পত্রটি শুরু করেন। তিনি সাধারণ জনগনকে জাগ্রত ও সং গঠিত করার জন্য 'বহিস্কৃত ভারত' এই পত্রিকা লিখে ছিলেন। এ ছাড়া তিনি আরো দুটি পত্রিকা 'জনতা' ও প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশিত করেছিলেন।

**মানচিত্র ও পরিকল্পনা :** মানচিত্র ইতিহাসের মহত্বপূর্ণ সাধন হিসেবে বিবেচিত হয়। মানচিত্র দ্বারা আমরা শহরের বা যে কোনো স্থানের পরিবর্তনশীল স্বরুপ অধ্যয়ন করতে পারি। ব্রিটিশ আমলে স্থাপন 'সর্বে আঁফ ইন্ডিয়া এই স্বতন্ত্র বিভাগ ভারতের বা ভারতের বিবিধ প্রান্তের, শহরের বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বেক্ষণ করে মানচিত্র তৈরী করেছেন। মানচিত্রের বাস্তু বিশারদগণ দ্বারা প্রস্তত পরিকল্পনাগুলি মহল স্থাপত্যশাস্ত্রের তেমনই যে কোনো ক্ষেত্রের বিকাশের স্তর অধ্যয়নের দৃষ্টিতে মহত্বপূর্ণ হয়। যেমন মুম্বই পোর্ট ট্রাস্ট এই

বিভাগের নিকটে মুম্বই পোর্টের মূল পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পোর্টের আরও বিকাশ করার সময় স্থাপতিদের এবং প্রকৌশলীদের দ্বারা তৈরী পরিকল্পনার দ্বারা আমরা মুম্বই নগরের বিকাশ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

**মৌখিক সাধন :** আধুনিক ভারতের ইতিহাসে মৌখিক সাধনের মধ্যে নিচে দেওয়া সাধনগুলির সমাবেশ রয়েছে।

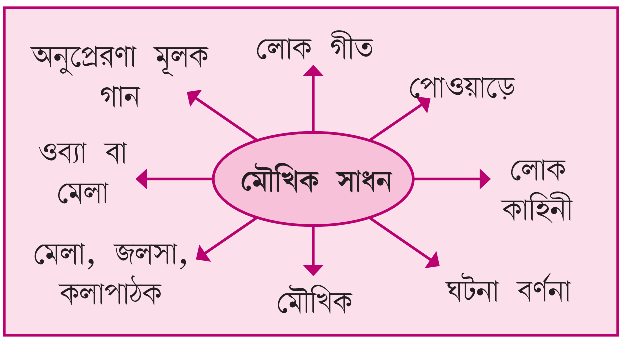


**অনুপ্রেরনামূলক গান (স্ফূর্তিদায়ক গীত) :** স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অনেক অনুপ্রেরনা মূলক গান রচনা করা হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক গান আজ ও লিখিত স্বরুপে উপলব্দ আছে। কিন্তু অনেক অপ্রকাশিত গানের মধ্যে অনুপ্রেরনা মূলক গান, স্বাধীনতা বিপ্লবীদের কন্ঠস্থ আছে। এই অনুপ্রেরনামূলক গান গুলো থেকে আমরা স্বাধীনতাপূর্ব সময়ের পরিস্থিতি, স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে প্রেরনা সম্বন্ধে তথ্য পাই।

**পোওয়াড়ে :** পোওয়াড়ে থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাবিষয়ে বা ব্যক্তির কতৃককার্য বিষয়ে জানা যায়। ব্রিটিশ আমলে ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন বিপ্লবীদের পরাক্রম এর উপর ভিত্তি করে পোওয়াড়ে রচনা করেছে। লোকের মধ্যে প্রেরনা ও চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এই পোওয়াড়ে ব্যবহার করা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো

**করে দেখো।**

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কানের সম্বন্ধে অনুপ্রেরনামূলক গীত ও পোওয়াড়ে সংগ্রহ করো ও তাহা উপস্থাপনা করো।

সত্যশোধক সমাজ পোওয়াড়াকারের মাধ্যমে শোষন হওয়া শ্রেণীর জাগৃতি, সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের সংগ্রাম এরমতো ঘটনার উপর ভিত্তি করে পোওয়াড়া রচনা করেছিল।

**দৃশ্য শ্রাব্য এবং দৃশ্য-শ্রাব্য সাধন :** আধুনিক সময়ে তন্ত্রজ্ঞানের বিকাশের ফলে ফটোগ্রাফি ধ্বনীমুদ্রিত চলচিত্র ইত্যাদি কলার বিকাশ হয়। অর্থাৎ তার থেকে নির্মান হওয়া ফটোগ্রাফি, ধ্বনীমুদ্রিত (সাউন্ড রেকডিং), চলচিত্রের ব্যবহার ইতিহাসের সাধন রুপে করা হয়।

**দৃশ্যচিত্র :** আধুনিক ভারতে দৃশ্য চিত্র এটি ইতিহাসের দৃশ্যরুপ সাধন দৃশ্য চিত্র (ফটোগ্রাফির) শিল্প খোঁজ হওয়ার পর বিভিন্ন ব্যক্তি, ঘটনা, বস্তুর ছবি তোলা ও বাস্তুর দৃশ্য চিত্র তৈরী করতে লাগল। এই দৃশ্য চিত্র থেকে আমরা ব্যক্তি ও প্রসঙ্গনুরুপ যেমন, ছিল বা ঘটেছে, তাহা দৃশ্য রুপে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সময়ে ব্যক্তি কেমন দেখা যেত বা ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটেছে তার ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু এসব ছবি কতটা বিশ্বাস যোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এর তুলনায় দৃশ্য চিত্র এটি বেশী বিশ্বাসনীয় বোঝা যায়। ব্যক্তি কেমন দেখায়, ব্যক্তির দৃশ্য চিত্র দেখে তার পরনে কি ছিল, এই বিষয়ে জানা যায়। দৃশ্য চিত্র দ্বারা ওই প্রসঙ্গ বা ঘটনা চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়। বাস্তু বা বস্তুর দৃশ্য চিত্র দ্বারা তার স্বরুপ বোঝা যায়।

**ধ্বনীমুদ্রিত (সাউন্ড রেকার্ডিং) :** দৃশ্য চিত্র (ফটোগ্রাফী) শিল্পকলা অনুসার ধ্বনিমূদ্রনের খোঁজ মহত্বপূর্ণ রয়েছে। ধ্বনীমূদ্রিত বা সাউন্ড রেকার্ডিং ইতিহাসের শ্রাব্য স্বরুপ সাধন। আধুনিক যুগে নেতারা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য করা ভাষন, গীত ধ্বনীমূদ্রিত স্বরুপ উপলব্ধ রয়েছে। ইহার ব্যবহার ইতিহাসের সাধন হিসেবে করা যেতে পারে। উদা. - স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ টাগরের গাওয়া গান 'জন গন মন' রাষ্ট্রগীত বা সুভাষচন্দ্র বোসের ভাষণ ইহার ব্যবহার আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অধ্যয়ন শ্রাব্য সাধন রুপে করা যেতে পারে।

**চলচ্চিত্র (ছায়াছবি) :** চলচ্চিত্র বা, ফিল্ম আধুনিক তন্ত্রঞ্জানের একটি প্রযুক্তির আবিষ্কার বলে মনে করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে চলচ্চিত্র তন্ত্রজ্ঞানের ভীষনভাবে উন্নতি হয়েছিল। দাদাসাহেব ফালকে ১৯১৩ সালে ভারতের চলচ্চিত্র (ছায়াছবি) সৃষ্টির মূহুর্ত শুরু করে ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দান্ডি যাত্রা, লবন সত্যাগ্রহ, চলেযাও আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার ধ্বনীফিতী অডিও ভিডিও পাওয়া যায়। চলচ্চিত্র ভিডিও গুলির মাধ্যমে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি আমরা দেখতে পাই।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগে কালের তুলনায় আধুনিক ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করার জন্য প্রচুর পরিমানে এবং বিভিন্ন প্রকারের সাধন উপলব্ধ রয়েছে। এই সময়ের ভৌতিক সাধন সম্পদ খুব ভালো অবস্থায় রয়েছে। অভিলেখাগৃহে বা পুস্তক সংগ্রহালয়ে যত্ন করে রাখা অনেক লিখিত সাধন সম্পদ উপলব্ধ আছে। লিখিত সাধন সাহিত্যের ব্যবহার করার সময় তাতে কি বিচার ধারা রয়েছে, কোন বিচার ধারায় প্রেরনা দিয়েছে, ঘটনাটির প্রতি অনুপ্রেরকের দৃষ্টিভঙ্গি কি তাহা দেখা উচিৎ। এরুপ সাধন সম্পর্কের যত্ন করা আবশ্যক। ঐতিহাসিক সাধনের সংরক্ষণ করার ফলে ইতিহাসের এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে ভবিষ্যতে আগের পিড়ির কাছে দেওয়া যাবে।

## অনুশীলনী

১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।

(১) ইতিহাসের সাধনের মধ্যে ............. সাধন আধুনিক তন্ত্রজ্ঞানের উপর ভিত্তি করা হয়েছে।
(অ) লিখিত (ব) মৌখিক
(ক) ভৌতিক (ড) দৃশ্য-শ্রাব্য

(২) পূনের ............. গান্ধী, স্মৃতিস্তম্ভ সংগ্রহালয়ে গান্ধীজীর ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।
(অ) আগাখান প্যেলেস
(ব) সাবরমতী আশ্রম
(ক) সেল্যুলর জেল
(ড) লক্ষ্মী বিলাস প্যলেস

(৩) বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক তন্ত্রজ্ঞানের একটি প্রযুক্তির আবিষ্কার মানে ............. ছিল।
(অ) পোওয়াড়া (ব) চলচ্চিত্র
(ক) সাক্ষাৎকার (ড) দৃশ্য চিত্র

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।

(১) ব্রিটিশ আমলে সংবাদপত্র সামাজিক জাগরনের সাহিত্য সাধন হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

(২) আধুনিক ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ছায়াছবি (ভিডিও) একটি অত্যন্ত বিশ্বাসনীয় সাধন হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

৩. টিপ্পনী (নোট) লেখো।

(১) দৃশ্য চিত্র (২) বস্তু সংগ্রহালয় এবং ইতিহাস
(৩) শ্রাব্য সাধন

৪. নিম্নলিখিত সংকল্পনা (ধারনা) চিত্র পূর্ণ করো।

**উপক্রম**

(১) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবিধ ঘটনার দৃশ্য চিত্র আন্তর জালের সাহায্যে সংগ্রহ করো।

(২) স্বাধীনতা সংগ্রামের বিখ্যাত নেতা এবং তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে তথ্য প্রাপ্ত করো ও পড়ো।

# ২. ইউরোপ এবং ভারত

আধুনিক যুগে ইউরোপে সংঘটিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফল ভারতে দৃশ্যমান ছিল। তাই আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক কাল অধ্যয়ন করতে গিয়ে ইউরোপে ঘটে যাওয়া ঘটনা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন হয়।

**পুনর্জাগরণ যুগ :** ইউরোপীয় ইতিহাসে মধ্য যুগের শেষ পর্যায়টি ১৩ শতক থেকে ১৬ শতক পুনর্জাগরন যুগ নামে পরিচিত। এই কালখন্ডে পুনর্জাগরন, ধার্মিক সুধার আন্দোলন, এবং ভৌগোলিক আবিস্কারের ঘটনা দ্বারা আধুনিক যুগের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তাই এই সময়কে 'পুনর্জাগরন যুগ' বলা হয়।

পুনর্জাগরন যুগে ইউরোপীয় শিল্প, স্থাপত্য, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রীক ও রোমান ঐতিহ্যের পুনর্জাগরন হয়েছিল। এটি সামগ্রিক অগ্রগতিতে প্রেরনা দিয়েছে। পুনর্জাগরনের সময় মানবতাবাদে মহত্ব লাভ করে। মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদল হয়েছে। ধর্মের পরিবর্তে মানুষ হয়ে ওঠে সকল চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু।

**লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি :** এনাকে পুনর্জাগরন যুগের সর্বগুণ সমপন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে মানা যায়। তিনি বহু বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ভাস্কর্য (শিল্পকলা), স্থাপত্য, গনিত, প্রকৌশল, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যার মতো বিভিন্ন বিষয়ে আয়ত্ত করেছিলেন তবে তিনি চিত্রশিল্পী হিসাবে বিশ্ব বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর আঁকা 'মোনালিসা' এবং 'দ্য লাস্ট সপর' অমর হয়ে আছে।

পুনর্জাগরন আন্দোলন মানব জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আয়ত্ব করেছে। জ্ঞান, বিজ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন কলা ক্ষেত্রে পুনর্জাগরন যুগের আন্দোলনের আবিস্কার দেখতে পাই। পুনর্জাগরন যুগে শিল্প ও সাহিত্য মানুষের আবেগ - অনুভূতি চিত্রিত করতে শুরু করে। আঞ্চলিক ভাষা থেকে সাহিত্যের উদ্ভব হতে থাকে যা মানুষে বুঝতে পারে। ই.স.১৪৫০ সালের দিকে জার্মানির জোহান্স গুটেনবার্গ ছাপাই যন্ত্রের আবিস্কার করেন। ছাপাখানার উদ্ভাবনের ফলে নতুন ধারনাও জ্ঞান সমাজের সবার কাছে পৌঁছাতে শুরু করে।

**ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন :** মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদী চিন্তাবিশারদ রোমান ক্যাথলিক চার্চের পারম্পারিক ধর্মীয় ধারনার কঠোর সমালোচনা করে। জনগনের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা আচার-অনুষ্ঠানের প্রচার করতেন। ধর্মের নামে মানুষের কাছ থেকে লুটপাট করত। এর প্রতিবাদে ইউরোপে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল একে বলে 'ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন'। এই আন্দোলনের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা ও বুদ্ধিমত্তা গুরুত্ব পায়।

**ভৌগোলিক আবিস্কার :** ১৪৫৩ খ্রি.অটোমান তুর্কিরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপন (ইস্তাম্বুল) জয় করে। এই নগর থেকে এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগকারী বানিজ্য পথ ছিল। তুর্কিরা এসব পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ, ইউরোপীয় দেশগুলির এশিয়ায় যাওয়ার নুতন পথের আবিস্কার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে। এটি ভৌগোলিক আবিস্কারের একটি নতুন যুগের প্রারম্ভ হয়।

**এটি বুঝে নাও।**

**ভৌগোলিক আবিস্কার :** পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ইউরোপীয় নাবিকরা ভারতে যাওয়ার জলপথ আবিস্কারের জন্য একটি সমুদ্র যাত্রা শুরু করেছিলেন।

- ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের খোজের জন্য বার্থোলোমিউ ডায়াস নামক পুর্তুগিজ নাবিক বেরিয়ে পড়ে কিন্তু তিনি আফ্রিকার গুড হোপ পর্যন্ত পৌছায়।
- ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিস্টোফার কলম্বাস পশ্চিমে ভারতের খোজের প্রচেষ্টা করে কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তিনি আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূলে পোঁছে ছিলেন।
- ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক বাস্কোদা -গামা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকাট নামক বন্দরগাছে পোঁছেছিলেন।

**করে দেখো।**

- বিশ্বের মানচিত্রে সমুদ্রযাত্রীদের দ্বারা আবিস্কৃত নতুন সমুদ্রপথ এবং অঞ্চলগুলি দেখাও।

**ইউরোপে আদর্শিক বিপ্লবী :** পুনর্জাগরন যুগে যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল ফলে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে ইউরোপের যাত্রা শুরু হয়। এই সময়ে ইউরোপে একটি আদর্শিক বিপ্লব ঘটেছিল। সমাজ অতীতের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং ঐতিহ্য এবং ঘটনাগুলিকে চিকিৎসা দৃষ্টিকোন থেকে দেখা শুরু হয়। এই পুরো পরিবর্তনকে বলা হয় 'আদর্শিক বিপ্লব'। এই আদর্শিক বিপ্লব ইউরোপে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান এবং আবিস্কারের দিকে প্রোৎসাহিত করে।

**রাজনৈতিক বিপ্লবী :** আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরোপে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। ১৮ এবং ১৯ শতকে সংঘটিত অনেক বিপ্লবী ঘটনার কারনে এই সময়টিকে 'বিপ্লবী যুগ' বলা হয়। এই সময়ে ইংল্যান্ডে সংসদীয় গনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। মন্ত্রিসভা পদ্ধতির বিন্যাস পরিবর্তন হয়েছিল। ১৬৮৯ সালে বিল অফ রাইটস রাজ ার কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করে। সংসদীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

**আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ :** ইউরোপে যে ক্রান্তিকারী ঘটনা ঘটে তারপটভূমিতে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা মহাদেশের খোজের পর ইউরোপীয় দেশগুলো এই মহাদেশের দিকে আকর্ষিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় দেশগুলো আমেবিকার বিভিন্ন অংশ দখল করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইংল্যান্ড উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে তেরোটি উপনিবেশ স্থাপন করে। প্রাথমিকভাবে এই উপনিবেশগুলির উপর ইংল্যান্ডের নামমাত্র অধিপত্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইংল্যাণ্ডের সংসদ আমেরিকান উপনিবেশগুলোর উপর কঠোর নিয়ম এবং কর লাগানো প্রারম্ভ করে। আমেরিকান উপনিবেশের স্বাধীনতাকামী জনতা এর বিরোধ করে। ইংল্যাড উপনিবেশগুলিকে দমন করার জন্য উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করে। আমেরিকান উপনিবেশবাদিরা জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সৈন্য সংগ্রহ করে প্রতিরোধ করেছিল। অবশেষে উপনিবেশিক সেনাবাহিনী বিজয়ী হয়। এই ঘটনাটি 'আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এর থেকে একটি নতুন দেশ-সংযুক্ত রাষ্ট্র আমেরিকা সংঘরাজ্যের উদয় হয়। যাতে শাসন প্রনালী লিখিত সংবিধান এবং গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান্য দেওয়া হয়।

**ফ্রান্সের রাজ্যক্রান্তি :** ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের জনগন এ ধরনের অন্যায় ও অন্যায় রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই ঘটনাটি 'ফ্রান্স রাজ্যক্রান্তি' নামে পরিচিত। ফান্স রাজ্যক্রান্তি বিশ্বকে দিয়েছে স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ।

বিশ্বের ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্রান্তিতে আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফ্রান্স রাজ্যক্রান্তির একটি বিশেষ স্থান আছে।

**শিল্প বিপ্লব :** আষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে থেকে ইউরোপের শিল্পক্ষেত্রে ক্রান্তিকারীক পরিবর্তন ঘটে। বাষ্পচলিত মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন শুরু হয়। ছোট ঘরঘুতি (ঘরের) ব্যবসা বড় কারখানা, দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। হাতের যন্ত্রের বদলে মেসিনের যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। যন্ত্রযুগের অবতরন হয়। একে বলা হয় 'শিল্প বিপ্লব'। শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডে শুরু হয়। তাঁর পর ধীরে-ধীরে পশ্চিমা বিশ্বেছড়িয়ে পড়ে। এই সময়কালে ইংল্যান্ডের শিল্প বিকাশ এতটাই ব্যাপক ছিল যে ইংল্যাডকে 'বিশ্বের কারখানা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

**পুঁজিবাদের উদয় :** নতুন সমুদ্রমার্গের সন্ধানের পর ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বানিজ্যের এক নতুন যুগের আরম্ভ হয়। অনেক ব্যবসায়ী সমুদ্রপথে পূর্বের দেশগুলোর সঙ্গে বানিজ্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে মাল বা বস্তু পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই অনেক ব্যবসায়ী এসে ব্যবসা শুরু করে। এর ফলে বেশ কিছু বানিজ্য কম্পানির উদয় হয়। যার কারনে পাশ্চাত্য দেশের সাথে বানিজ্যে লাভ হয় ওঠে। বানিজ্যের ফলে দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে। ফলে ইউরোপীয় শাসক বানিজ্য কম্পানিকে সেনা সুরক্ষা ও বানিজ্যের সুবিধা দেয়। এই বানিজ্যের ফলে ইউরোপীয় দেশে ধনসঞ্চয়নে বৃদ্ধী হয়। এই সম্পদগুলি পুঁজি বানিজ্য ও শিল্পে ব্যবহার করা শুরু করে। এর ফলে ইউরোপীয় দেশগুলোতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদয় হয়।

**উপনিবেশবাদ :** এক দেশের কিছু লোকের দ্বারা অন্য ভূখন্ডের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসতি স্থাপন করাকে উপনিবেশবাদ বলে। অর্থনৈতিক ও সৈন্যবাহিনী দিক থেকে শক্তিশলী দেশের শক্তিতে কোনো ভূখণ্ড দখল করে কোনো অঞ্চলে তার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে উপনিবেশিকতা বলে। ইউরোপীয় দেশগুলোর এই উপনিবেশিক মানসিকতা থেকেই সাম্রাজ্যবাদের উদয় হয়।

**সাম্রাজ্যবাদ :** উন্নত রাষ্ট্র দ্বারা অনুন্নত রাষ্ট্রের উপর তার সমগ্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং অনেক নতুন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ ইউরোপীয় দেশগুলোর এই সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাভক্ষার শিকার হয়।

**ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির সাম্রাজ্যবাদ :** ভারতে তাদের বানিজ্যের একাধিকার অধিকার অর্জনের জন্য ইউরোপীয় সত্তার মধ্যে ভিষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ১৬০০ খ্রি. ব্রিটিশরা ভারতে বানিজ্য করার জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পনী প্রতিষ্ঠা করে। এই কম্পানিটি জাহাঙ্গীর বাদশাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সুরতে একটি গুদাম স্থাপন করে। এই কম্পনির দ্বারা ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে বানিজ্য চলত।

**ব্রিটিশ এবং ফ্রান্সিসিদের মধ্যে দ্বন্দ :** ভারতে চলমান বানিজ্য প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ এবং ফারসিরা একে অপরের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য ব্রিটিশ এবং ফারসিদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধগুলি 'কর্নাটক যুদ্ধ' নামে পরিচিত। তৃতীয় কর্নাটক যুদ্ধে ব্রিটিশরা ফারসিদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। ফলে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পনির সামনে কোনো প্রবল ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্ধী ছিল না।

**বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পনীর ক্ষমতার ভিত্তি :** বাংলা প্রান্ত ছিল ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধশালী প্রদেশ। ১৭৫৬ খ্রি. সিরাজ উদদ্দৌলা বাংলার নবাব হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পনীর অধিকারীরা মুঘল শাসকদের কাছ থেকে বাংলা প্রান্তের বানিজ্য সুবিধা প্রাপ্ত করে এবং অধিকারী বানিজ্য সুবিধার অপব্যবহার করে। ব্রিটিশরা নবাবের অনুমতি ছাড়াই কলকাতায় তাদের গুদামের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করে। ফলস্বরূপ সিরাজ উদ্দৌলা ব্রিটিশদের উপর আক্রমন করে এবং কলকাতার গুদাম নিজের অধিনে করে নেয়। এই ঘটনার কারন ইংরেজদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা

দেয়। রবার্ট ক্লাইভ কূটনীতির মাধ্যমে নবাবের সেনাপতি মীর জাফরকে নবাবের পদের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে করে নেয়। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা এবং ইংরেজ সেনাবাহিনীরা পলাশী নামক স্থানে সামনা সামনি হয়। কিন্তু মীরজাফরের নেতৃত্বে নবাবের সেনাবাহিনী যুদ্ধে নামে না ফলে এই যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা পরাজিত হয়।

ইংরেজদের সমর্থনে মীরজাফর বাংলার নবাব হয়। পরে সে প্রতিরোধ করলে তার জামাই মীর কাসিমকে নবাব করে। মীর কাসিম ব্রিটিশদের অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তাই ইংরেজরা মীরজাফরকে পুনরায় নবাব উপাধি দেয়।

বাংলায় ইংরেজদের অনৈতিক কামকাজের উপর প্রতিরোধ লাগানোর জন্য মীর কাসিম, অযোধ্যার নবাব শুজা উদ্দৌলা এবং মুখল সম্রাট শাহ-আলাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে একত্রিত অভিমান শুরু করে। ১৭৬৪ সালে বিহারের বক্সারে এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজরা বিজয় হয়। এই যুদ্ধের পর এলাহাবাদের সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পনির বাংলার সুবাহ দিওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়। এভাবেই ভারতে ইংরেজ সত্তার ভিত্তি স্থাপন হয়।

**ইংরেজ-মৈসূর সংগ্রাম :** মৈসূর রাজ্যের হায়দার আলী বিদ্রোহ করে মৈসূর রাজ্য নিজের অধিনে করে নেয়। হায়দার আলীর মৃত্যুর পর তার পুত্র টিপু সুলতান মৈসূরের গদীতে বসে। সে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রাণপনে যুদ্ধ করে। অবশেষে ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গপট্টন নামক স্থানে যুদ্ধে টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়। এই ভাবে ব্রিটিশরা মৈসূর প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করে।

টিপু সুলতান

**সিন্ধ প্রান্তে ব্রিটিশদের অধিকার :** ভারতে নিজেদের ক্ষমতা সুরক্ষিত করার জন্য, ব্রিটিশরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে লক্ষ্য দেয়। তাদের ভয়ছিল যে রাশিয়া ভারতে আফগানিস্তানের পথে আক্রমন করবে। ফলস্বরূপ ব্রিটিশরা আফগানিস্তানে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। আফগানিস্তানের পথগুলো সিন্ধ প্রান্তের মধ্য দিয়ে যায়। অতএব সিন্ধ প্রান্তের মহত্ব ব্রিটিশরা বুঝতে পারে এবং ১৮৪৩ সালে সিন্ধ প্রান্ত নিজেদের অধিনে করে নেয়।

**শিখ সাম্রাজ্যের পরাজয় :** উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাঞ্জাব সাম্রাজ্য রঞ্জিত সিংয়ের হাতে ছিল। রঞ্জিত সিংয়ের মৃত্যুর পর তার যুবক পুত্র দলীপ সিং সিংহাসনে আরোহন করেন। তার পক্ষ থেকে তার মাঁ রানী জিন্দান রাজ্যের শাসন ভার চালাতে লাগলেন। কিন্তু প্রধানদের উপর তার কোন নিযন্ত্রণ ছিল না। এই সুযোগ পেয়ে ব্রিটিশরা কিছু শিখ প্রধানকে নিজের পক্ষে করে নেয়। শিখরা বুঝতে পেরেছিল যে ব্রিটিশরা পাঞ্জাবে আক্রমন করবে এমন ধারনা শিখরা ভাবতে লাগল ফলস্বরুপ তারা ব্রিটিশদের উপর আক্রমন করে। শিখ-ব্রিটিশদের যুদ্ধে শীখদের পরাজয় হয়। ব্রিটিশরা দলীপ সিংকে সিংহাসনেই রাখে। পাঞ্জাবে ব্রিটিশদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বেড়েই চলছিল কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় শিখদের কাছে গ্রহনযোগ্য ছিল না। মুলতানের এক অধিকারী মূলরাজ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই যুদ্ধে হাজার-হাজার শিখ সৈন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হয়। ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশরা পাঞ্জাব প্রান্ত নিজের রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে নেয়।

রঞ্জিত সিং

মারাঠা সত্তা ছিল ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রবল সত্তা। পরবর্তী পাঠে আমরা অধ্যয়ন করব যে ব্রিটিশরা মারাঠাদের পরাজিত করে ভারতে তাদের ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপিত করেছিল।

## অনুশীলনী

১. **দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(১) ১৪৫৩ সালে অ্যাটোমান তুর্কিরা ............. শহরটি জয় করেছিল।

(অ) ভেনিস (ব) কনস্টান্টিনোপল
(ক) রোম (ড) প্যারিস

(২) শিল্প বিপ্লবের আরম্ভ ............. হয়।

(অ) ইংল্যাড (ব) ফ্রান্স
(ক) ইটলী (ড) পর্তুগাল

(৩) ব্রিটিশদের অবৈধ্য বানিজ্য রোধের প্রচেষ্টা ............. করেন।

(অ) সিরাজ উদ্দৌলা (ব) মীর কাসিম
(ক) মীর জাফর (ড) শাহ আলম

২. **নিচের সংকল্পনা স্পষ্ট করো।**

(১) উপনিবেশবাদ (২) সাম্রাজ্যবাদ
(৩) পুনর্জাগরন যুগ (৪) পুঁজিবাদ

৩. **নিচের উক্তি গুলোর কারনসহ স্পষ্ট করো।**

(১) পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ উদ্দৌলা পরাজিত হন।

(২) ইউরোপীয় দেশগুলির এশিয়ার দিকে যাওয়ার একটি নতুন পথ খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে লাগল।

(৩) ইউরোপের শাসক বানিজ্য কম্পানিকে সৈন্য সুরক্ষা এবং বানিজ্য সুবিধা প্রদান করে।

৪. **পাঠের নিম্ন সারনী পুর্ণ করো।**

| সমুদ্রী নাবিক | কার্য |
|---|---|
| ................. | আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছেছিল। |
| ক্রিস্তোফার কোলম্বাস | ...................<br>................... |
| ................. | ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকাত জাহাজ ঘাটিতে পৌঁছায়। |

**উপক্রম**

পুনর্জাগরন যুগে বিখ্যাত চিত্র শিল্পী, সাহিত্যকার ও বিজ্ঞানীদের কাজের সংদর্ভ গ্রন্থ এবং ইন্টারনেটের সাহায্যে তথ্য ও ছবি নিয়ে শ্রেনীকক্ষে প্রকল্পটি উপস্থাপন করো।

# ৩. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিনাম

এই পাঠে আমরা ভারতে ব্রিটিশ সাম্ররাজ্যের কি পরিনতি ঘটে তার অধ্যয়ন করব।

**ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির প্রতিষ্ঠা :** আমরা দেখেছি কীভাবে ভৌগোলিক খোঁজের কারনে ইউরোপীয় শক্তিসালী দেশগুলি ভারতের তীরে এসেছিল। পর্তুগিজ, ডাচ, ফারসি, ব্রিটিশ এই সকল ইউরোপীয় ভারতের বাজার নিজেদের অধিনে নেওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল। ব্রিটিশরা যখন বানিজ্যের জন্য ভারতে এসেছিল, তখন ভারতে আগে থেকে থাকা পর্তুগিজরা তাদের কঠোর ভাবে বিরোধ করেছিল। পরে ব্রিটিশ এবং পর্তুগিজদের সম্পর্ক বন্ধত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বিরোধ কম হয়ে যায়। কিন্তু ভারতে আধিপত্য স্থাপনার জন্য ব্রিটিশদের ফ্রেঞ্চ, ডাচ এবং স্থানীয় সত্তাধারিদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

**ইংরেজ ও মারাঠা :** মুম্বাই ছিল পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান কেন্দ্র। মুম্বাইয়ের আশেপাশের অঞ্চল নিজেদের অধিকারে করে নেওয়ার প্রচেষ্ঠা করে, কিন্তু এই অঞ্চলে মারাঠারা ভিষণ শক্তিশালী ছিল। মাধবরাও পেশওয়ার মৃত্যুর পর, পেশওয়া পদের লালসার জন্য তার কাকা রঘুনাথরাও ইংরেজ দের সাহায্য চেয়েছিল। এই প্রকার মারাঠাদের রাজনীতিতে ব্রিটিশদের প্রবেশ হয়।

১৭৭৪ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে মারাঠা এবং ইংরেজদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধ মারাঠা প্রধানরা একতার সহিত যুদ্ধ করে। ফলে মারাঠাদের বিজয় হয়। ১৭৮২ সালে সালবাই চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজ এবং মারাঠাদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ শেষ হয়।

**স্থাপনা বাহিনী (তৈনাতী সেনা) :** ১৭৯৮ সালে লার্ড বেলেসলি ভারতে গভর্নর হিসাবে আসে। তাঁর নিতি ছিল সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই জন্য সে অনেক ভারতীয় শাসকের সাথে স্থাপন বাহিনী (তৈনাতী সেনার) চুক্তি করে। এই চুক্তির অধীনে ভারতীয় শাসকদের ব্রিটিশ সেনার সহায়তার আশ্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর জন্য কিছু শর্ত রাখা হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে ভারতীয় রাজা তাদের রাজ্যে ইংরেজদের সেনা রাখতে লাগল। এই সেনাবাহিনীর খরচের জন্য নগদ রাশি অথবা ততটা আয়ের অঞ্চল কম্পনীকে দিতে হবে। ভারতীয় শাসকদের অন্য শাসকদের সাথে সম্পর্ক রাখতে ইংরেজদের মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক রাখতে হবে। তাদের দরবারে ইংরেজদের একজন রেজিডেন্ট (প্রতিনিধি) রাখতে হবে। ভারতের কিছু শাসক এই চুক্তি অবলম্বন করে এবং তাদের স্বাধীনতা হারায়।

১৮০২ সালে বাজীরাও দ্বিতীয় ইংরেজদের সাথে স্থাপনা বাহিনী (তৈনাতী সেনা) ছক্তি করে। এই চুক্তি বসই চুক্তি নামে পরিচিত। কিন্তু কিছু কিছু মারাঠা সরদার এই চুক্তি মেনে নেয়নি। ফলে মারাঠা এবং ইংরেজদের মধ্য দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। বিজয়ের পর ইংরেজরা মারাঠা রাজ্যে হস্তক্ষেপ বাজীরাও দ্বিতীয়ের অসহনীয় হয়ে ওঠে ফলে বাজীরাও দ্বিতীয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা করেন। ১৮১৮ সালে তিনি আত্মসমর্পন করেন। এদিকে মুগল রাজধানী দিল্লী আসলে দৌলতরাও শিন্দের নিয়ন্ত্রণে ছিল। শিন্দে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার পর জেনারেল লেক মুঘল সম্রাটকে বন্দী করে এবং হিন্দুস্থান জয় করে।

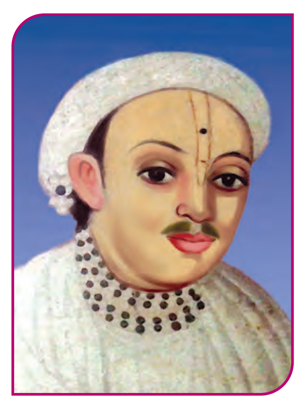
ছত্রপতী প্রতাপসিং

**ছত্রপতী প্রতাপসিং :** পেশওয়াই অস্ত হওয়ার পরেও সাতারার ছত্রপতী প্রতাপসিং সিংহাসনে ছিলেন। ব্রিটিশরা ছত্রপতী প্রতাপ সিংয়ের সাথে একটি চুক্তি করে এবং তাকে রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য গ্রান্ড ডাফ নামে একজন অধিকারী নিয়োগ করে। কিন্তু পরে তাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে কাশীতে রাখা হয়। ১৮৪৭ সালে তিনি সেখানে মারা যান। ছতপতি প্রতাপ সিংয়ের প্রধান প্রশাসক রঙ্গো বাপুজি গুপ্তে ইংল্যেন্ডে গিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের

ন্যায়বিচার পাওয়ার চেষ্টা বিফল হয়। আগে গিয়ে ল্যার্ড ডালহৌজী দত্তক গ্রহনকে (দত্তক বিধান) প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৮৪৮ সালে সাতারা রাজ্যকে দখল করে নেয়।

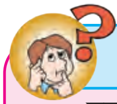

**তুমি জানো কি ?**

ছত্রপতী প্রতাপসিং সাতারা শহরের ইয়েবতেশ্বর মন্দিরের পিছনে এবং মহাদরায় তালাবেব নির্মান করে এবং ওই তালাবের জল শহরে নিয়ে আসেন। শহরে রাস্তা তৈরী করেছেন, রাস্তার দুই পাশে গাছপালা লাগায়, তিনি সংস্কৃত, মারাঠী এবং ইংরেজী শেখার জন্য ছেলে ও মেয়েদের জন্য স্কুল তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং বহু প্রয়োজনীয় বই ছাপান। ১৮২৭ সালে তিনি 'সভানিতি' নামে রাজনীতির উপর একটি বই লিখে প্রকাশ করেন। তিনি সাতারা থেকে মহাবলেশ্বর হয়ে প্রতাপগড় পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করেন। এই রাস্তা পরে মহাড় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। ছত্রপতী প্রতাপসিং প্রতিদিন নিজের ডায়েরি লিখতেন।

## ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতের পরিনতি

**দুহেরী রাজ্যব্যবস্থা :** রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে বাংলায় দুহেরী রাজ্যব্যবস্থা শুরু করে। রাজস্ব আদায় করার কাজ কম্পনির হাতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজ বাংলার নবাবের ওপর ছেড়ে দেয়। একে বলা হয় দুহেরী রাজ্যব্যবস্থা সময়ের সাথে-সাথে দুহেরী রাজ্যব্যবস্থার দুষ্পরিনামের প্রভাব দেখা দেয়।

সাধারন জনগনের কাছ থেকে কর (খাজনা) আকারে আদায় করা অর্থ কম্পনির অধিকারীদের পকেটে যায়। ভারতে বানিজ্য করার অধিকার সুধু মাত্র ইস্ট ইন্ডীয়া কম্পানির ছিল। তাই ইংল্যান্ডের কিছু বনিক এই কম্পনির প্রতি ঈর্ষা করতেন। ভারতে কম্পানির প্রশাসনে আলোচনা ইংল্যাডে হতে লাগে। তখন কম্পানির প্রশাসনে নিয়ন্ত্রনেরজন্য ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করে।

**পার্লামেন্ট (সংসদ) দ্বারা তৈরি আইন :** ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে, বাংলার গভর্নরকে 'গভর্নরজেনারেল' উপাধি দেওয়া হয়। এই আইনের অধীনে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর - জেনারেল হন। তাকে মুম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রান্তের নীতি নিয়ন্ত্রনের অধিকার দেওয়া হয়। তাকে সহায়তার জন্য চারটি সদস্যের একটি কমিটি করা হয়।

১৭৮৪ সালে ভারতে পিটস অ্যাক্ট পাস হয়। ভারতে কম্পানির শাসনের উপর সংসদকে নিযন্ত্রণ করার জন্য একটি স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। এই সংস্থাকে কম্পানির দ্বারা ভারতে শাসনের আদেশ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ১৮১৩, ১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সালে কম্পানির শাসন ব্যবস্থায় সংশোধন করার আইন সংসদে তৈরী করা হয়। এই প্রকার কম্পানির প্রশাসন ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ব্রিটিশ শাসনের আগমনের সাথে, নতুন শাসন ব্যবস্থা ভারতে আদর্শ হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক সেবক ব্যবস্থা, সেনা, পুলিস বল এবং বিচার বিভাগ ছিল ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রধান ভিত্তি।

**প্রশাসনিক সেবক ব্যবস্থা (সিবীল সর্ভিস) :** ভারতে ব্রিটিশ সত্তা সুসংহত করার জন্য ব্রিটিশদের একটি সেবক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। লার্ড কার্ণওয়ালিস সেবক ব্যবস্থা তৈরি করে। সেবক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপুর্ণ ভাগ হয়ে ওঠে। কম্পানির অধিকারী নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা করবে না, এমন আইন তৈরী হল। এই জন্য কম্পানি অধিকারীদের বেতনে বৃদ্ধি করে।

প্রশাসনের সুবিধার্থে ব্রিটিশ অধিকারীরা নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলগুলোকে জেলায় ভাগ করে। জেলাধিকারী (কালেক্টর) ছিলেন জেলা সরকারের প্রধান। তাঁর দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ, বিচার পরিচালনা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। অধিকারীদের নিযুক্তি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের (I.C.S.) নামে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া শুরু হয়।

**সেনা এবং পুলিশবল :** ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলি রক্ষা করা, নতুন অঞ্চল দখল করা এবং ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ দমন করা সেনাবাহিনীর কাজ ছিল। পুলিশ দলের কাজ ছিল দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

**ন্যায় ব্যবস্থা :** ব্রিটিশরা ইংল্যান্ডের ন্যায় ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ভারতে একটি নতুন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিটি জেলায় দেওয়ানি মামলার জন্য দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি মামলার জন্য ফৌজদারি আদালত স্থাপন করে। তাদের মামলা পুনর্বিবেচনা জন্য উচ্চ আদালত স্থাপন করা হয়েছিল।

**আইনের সামনে সমতা (বিধি শাসন) :** পূর্বে ভারতে ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন-বিভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। ন্যায় প্রদান করার জন্য জাতপাতের অনুসারে ভেদভাব করা হতো। লার্ড ম্যাকালের নেতৃত্বে লেজিসলেটিভ কমিটি আইনের সংহিতা তৈরি করে। সম্পূর্ন ভারতে একই আইন ব্যবহার করা হয়। আইনের সামনে সবাই সমান, এই সিদ্ধান্তটি ইংরেজরা শুরু করে।

এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধাও ছিল। ইউরোপীয়দের বিচারের জন্য আলাদা আদালত ও আলাদা আইন ছিল। নতুন আইন সাধারন মানুষ বুঝতে পারেনি। ন্যায়বিচার সাধারন মানুষ বুঝতে পারেনি। ন্যায়বিচার সাধারন মানুষের জন্য একটি ব্যায়বহুল ব্যাপার ছিল। বছরের পর বছর ধরে মামলা চলতে থাকত।

**ব্রিটিশদের আর্থিক নীতি :** প্রাচীনকাল থেকে ভারতে আক্রমন চলে আসছে। অনেক আক্রমনকারী ভারতে বসতী স্থাপন করে। তারা ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে। তারা এখানে শাসন করলেও ভারতীয় অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনেনি। ইংরেজরা অবশ্য তা করেনি।

ইংল্যান্ড একটি আধুনিক রাষ্ট্র ছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে সেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থারজন্য পোষক এমন অর্থব্যবস্থা তারা ভারতে প্রচলিত করে। ফলে ইংল্যান্ডের আর্থিক লাভ হয় কিন্তু ভারতীয়দের আর্থিক শোষণ হয়।

**ভূমি রাজস্ব নীতি (খাজনা) :** ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পূর্বে গ্রামের অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের মাধ্যমে গ্রামের চাহিদা মেটানো হতো। ভূমি রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। ইংরেজদের পূর্বে সময় ফসলের অনুযায়ী খাজনা নির্ধারন করা হতো। ফসল ভাল না হলে খাজনায় ছুট ছিল। রাজস্ব মূলত খাদ্যশস্যের আকারে সংগ্রহ করা হতো। খাজনা দিতে বিলম্ব হলেও কৃষকদের কাছ থেকে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়নি।

আয় বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশরা রাজস্ব ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। ব্রিটিশরা ভূমিকা পরিমাপ করে জমির ক্ষেত্রফল অনুযায়ী খাজনা নির্ধারন করে। খাজনা নগদ এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য কঠোরভাবে প্রতাড়না করা হতো। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাজনা পরিশোধ না করলে কৃষকদের জমি সরকার অধিগ্রহন (যপ্ত) করবে বলে নিয়ম করা হয়েছিল। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশদের রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। কৃষকরা সর্বত্র শোষিত হতে থাকতেন।

**নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব :** নতুন ভূমির রাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব ছিল গ্রামীন জীবনে। কৃষকরা সেই দামে তাদের ফসল বিক্রি করতে শুরু করে যে দামে খাজনা ভরা যাবে। ব্যবসায়ী ও আড়তিয়ারা উচিত মূল্য থেকে কম মূল্য তাদের উৎপাদিত পন্য কিনতে শুরু করে। সময় পড়লে কৃষকদের খাজনা ভরার জন্য মহাজনদের কাছে তার ক্ষেত বন্ধক রেখে ঋন নিতে হয়েছে। ফলে কৃষকরা ঋনগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ঋন পরিশোধ না করতে পারলে তাদের ক্ষেত বিক্রি করতে হতো। সরকার, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ীরা এরা সকলে কৃষকদের শোষণ করত।

**কৃষির বানিজ্যিকীকরন :** আগে কৃষক প্রধানত খাদ্যশস্য কৃষক গৃহস্থালির কাজে এবং গ্রামের চাহিদা মেটাতে ব্যবহার করত। এখন ব্রিটিশ সরকার তুলা, নীল, তামাক, চায়ের মতো অর্থকরী ফসলকে উৎসাহিত করতে শুরু করে। খাদ্যশস্যের ফলন গ্রেহনের চেয়ে বেশি মুনাফা দেয় এমন

বানিজ্যিক বা অর্থকরী ফসল গ্রহনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'কৃষিক বানিজ্যিকীকরন'

**অকাল :** ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ভারতে প্রচুর অকালের পরিস্থিতি দেখা দেয়, কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা অকাল প্রতিরোধে পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা করেনি। এবং জল সরবরাহ প্রকল্পেও পর্যাপ্ত ব্যয় করেনি।

**পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি :** বানিজ্য বৃদ্ধি এবং প্রশাসনের সুবিধার্যে ব্রিটিশরা ভারতে পরিবহন ও যোগাযোগের আধুনিক সুবিধা তৈরী করেছিল। তারা কোলকাতা ও দিল্লী জোড়ার জন্য হাইওয়ে (রাজমার্গ) তৈরি করে। ১৮৫৩ সালে মুম্বই-থানে রেল মার্গে রেল চলতে শুরু করে। একই বছরের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারতে টেলিগ্রাম যন্ত্রের মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা শুরু করে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের প্রধান শহর এবং সেনাবাহিনীর স্থান একে-অপরের সাথে জোড়া হয় এবং ব্রিটিশরাও ডাক ব্যবস্থা শুরু করে।

মুম্বই-ঠানে রেল (১৮৫৩)

এই সমস্ত উন্নতির জন্য ভারতীয় সমাজের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বৃদ্ধি হয়। ফলে তাদের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি বৃদ্ধিতে সহযোগিতা পায়।

**ভারতে পুরাতন শিল্পের অবনতি :** ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যাওয়া জিনিসপত্র (পন্য) ওপর ব্রিটিশ সরকার প্রচুর কর আদায় করত। বিপরীতে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসা জিনিসপত্র (পন্য) উপর খুব কম কর আদায় করা হত। এই ভাবে ইংল্যান্ড থেকে আসা জিনিসপত্র মেশিনে তৈরী করা হতো। ফলস্বরূপ, পণ্যগুলি প্রচুর পরিমানে এবং কম খরচে উত্পাদিত হয়। ভারতীয় কারিগরদের জন্য এত সস্তা পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা কঠিন ছিল। ফলে ভারতের পারস্পারিক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং বহু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে।

**ভারতে নতুন শিল্পের বিকাশ :** ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা, ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা এবং পুঁজির মতো জিনিসের অভাবে উদ্যোক্তারা বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসতে পারেনি। তা সত্ত্বেও, এই ধরনের অনেক বাধা অতিক্রম করে, অনেক ভারতীয় শিল্পের নির্মাণ হয়।

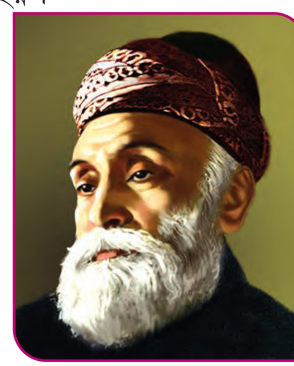

জমশেদজী টাটা

১৮৫৪ সালে কাবসজী নানাভায দাবর মুম্বাইতে প্রথম কাপড়ের মিল শুরু করেন। ১৮৫৫ সালে বাংলার রিশ্রায় পাটের প্রথম মিল চালু হয়। ১৯০৭ সালে জমশেদজী টাটা জমশেদপূরে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কম্পানির একটি ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতে কয়লা, খনিজ, ধাতু চিনি, সিমেন্ট এবং রাসায়নিক পদার্থের মতো শিল্প শুরু হয়েছিল।

**সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিনতি :** উনিশ শতকে ইউরোপে মানবতাবাদ, আদর্শ, গনতন্ত্র, উদারনীতির মতো নতুন মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি নতুন যুগের জন্ম হয়। পশ্চিমা বিশ্বের এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া ভারতে স্বাভাবিক ছিল। ব্রিটিশদের প্রশাসন পরিচালনার জন্য ভারতীয় সমাজকে খুব ভালভাবে জানা প্রয়য়ন ছিল। এ জন্য তারা এখানকার ঐতিহ্য, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সঙ্গীত, পশু-পাখির অধ্যয়ন শুরু করে। ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ অফিসার উইলিয়াম

জোন্স কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেন। জার্মান বিচারক ম্যাক্স মুলার ছিলেন ভারতীয় ধর্ম, ভাষা ও ইতিহাসের একজন গভীর পন্ডিত।

এই উদাহরনগুলির দ্বারা আমরা আমাদের ধর্ম, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যগুলিও অধ্যয়ন করা উচিত এই উপলব্ধি নবশিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে উদিত হতে লাগে। ব্রিটিশরা ভারতে নতুন আইন তৈরী করে। ১৮২৯ সালে লার্ড বেন্টিক সতীদাহ প্রথা নিষেদ্ধ করার জন্য একটি আইন তৈরি করে। ১৮৫৬ সালে লার্ড ডালহৌসি বিধবা পুনর্বিবাহ আইন তৈরি করে। এই আইন ধর্মীয় সংস্কারের দৃষ্টিকোন থেকে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছিল।

ব্রিটিশদের প্রশাসন পরিচালনার জন্য ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রয়োজন ছিল। ১৮৩৫ সালে লার্ড ম্যাকলের সেফারিশ অনুসারে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়। ভারতীয়রা নতুন শিক্ষার মাধ্যমে নতুন পশ্চিমা ধারনা, আধুনিক সংস্কার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, মুম্বই, মাদ্রাজ (চেন্নাই) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পশ্চিমা শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ভারতে সামাজিক পুনর্জাগরন আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(১) পর্তুগিজ, .............., ফারসি এবং ব্রিটিশরা ভারতের বাজার দখলের জন্য সত্তার দৌড়ে নেমেছিল।

(অ) আস্ট্রিয়ান (ব) ডচ
(ক) জার্মন (ড) স্বীডীশ

(২) ১৮০২ সালে ............. ব্রিটিশদের সাথে সহযোগী চুক্তি করেছিল।

(অ) বাজীবাও প্রথম
(ব) মওয়াই মাধবরাও
(ক) পেশওয়া নানাসাহেব
(ড) বাজীরাও দ্বিতীয়

(৩) জমশেদজী টাটা ............. এ টাটা আয়রন এবং স্টীল কম্পানির একটি ইস্পাত উৎপাদনের কারখানা স্থাপীত করে।

(অ) মুম্বাই (ব) কোলকাতা
(ক) জমশেদপুর (ড) দিল্লী

**(২) নিচের সংকল্পনা স্পষ্ট করো।**

(১) প্রশাসনিক সেবক ব্যবস্থা
(২) কৃষির বানিজীকরন
(৩) ব্রিটিশদের আর্থিক নীতি

**৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।**

(১) ভারতের কৃষকরা ঋনগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
(২) ভারতের শিল্পও ব্যবসা কমে যায়।

**৪. পাঠের নিম্ন সারনী পূর্ণ করো।**

| ব্যক্তি | কার্য |
|---|---|
| লার্ড কার্নওয়ালিস | ........................ |
| ........................ | সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আইন তৈরি করে। |
| লার্ড ডলহৌজী | ........................ |
| ........................ | এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা। |

**উপক্রম**

প্রশাসন, শিক্ষা, পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থায় ব্রিটিশরা যে সংস্কার করেছিল তার ছবিসহ তথ্য প্রস্তুত করো।

# ৪. ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সত্তাকে সংগ্রাম মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ভারতে একটি হয়। এই যুদ্ধ হঠাৎ করে ঘটেনি। এর আগেও ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতাবীর সাবরকর যে বইটিতে যুদ্ধের ব্যাপ্তি এবং এর পটভূমিকে সামনে রেখে এই যুদ্ধকে উপস্থাপন করেছিলেন, সেই বই ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধ) পরে আগোনা বিপ্লবীকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনুপ্রানিত করেছিল।

**১৮৫৭ এর পূর্বকালিন যুদ্ধ :** ভারতের যেসব স্থানে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হয়েছিল, সেখানকার জনগনকে ব্রিটিশ শাসনের কুফল ভোগ করতে হয়েছে। কম্পানির কতৃত্বের কারনেই আমরা সর্বস্তরে শোষিত হচ্ছি, এমন বোধ ভারতীয়দের মনে উৎপন্ন হয়। এবং শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়তে লাগে।

কৃষক ও সাধারন মানুষ কম্পানি সরকারের আমলে দরিদ্র হয়ে পড়ে। এভাবে ১৭৭০ সালে বাংলা প্রান্তে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ পড়ে। সাধারন মানুষের ছিল খুবই উদাসীন ও সংবেদনশীল। ১৭৬৩ সাল থেকে ১৮৫৭ এর কালখন্ডে বাংলায় প্রথম তপস্বী এবং কৃষকদের নেতৃত্বে সংঘর্ষ হয়।

গুজরাট রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিন ভারতেও সংগ্রাম হয়েছিল।

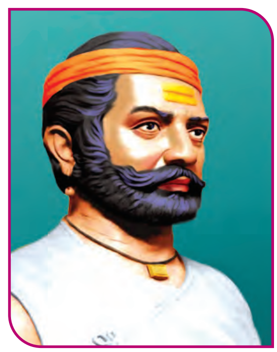

উমাজি নাইক

উমাজী নাইক যে সংগ্রাম করেছিলেন তা ছিল তীব্র স্বরুপের তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি ঘোষনাপত্র জারি করেছিলেন এবং ব্রিটিশ সত্তা মেনে নেননি। তিনি তার ধাক পুনে, সাতারা, অহমদনগর, সোলাপুর, নাশিক, ভোর ইত্যাদি অঞ্চলে তৈরী করে। ১৮৩২ সালে কম্পানির সরকার উমাজী নাইককে বন্দী করে এবং পুনাতে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ভারতে আদিবাসী ও বনবাসীরাও ব্রিটিশ শাসনকে আহ্বান করোছিল। এই উপজাতিদের জীবিকা বন সম্পদের উপর নির্ভর করত। ব্রিটিশরা আইন করে তাদের অধিকার বজ্রপাত করেছিল। ফলস্বরুপ বিহার এবং ছোট নাগপুর পরিসরের কোলাম, উড়িশার গোল্ড, বিহারের সাঁওতালরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড লড়াই করেছিল। মহারাষ্ট্রে ভীল, কোলি (জেলে), পিন্ডারিরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করেছিল। এবং কোকনে ফোন্ড-সাবন্তরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আহ্বান করেছিল। ১৮৫৭ সালে আগে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু জমিদার ও রাজ-রাজ্যেরাও প্রচন্ড লড়াই করেছিল।

### তুমি জানো কি ?

**পাইকের যুদ্ধ :** মধ্যযুগ থেকে ওড়িশায় পাইক প্রথা চালু ছিল। বিভিন্ন স্বাধীন রাজ ার যারা দাড়ানো সেনা ছিলৎ তাদের ‘পাইক’ বলা হত। রাজারা এই পাইকদের চাষের জন্য জমি দিয়েছিলেন। ওই জমি চাষ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। বিনিময়ে যুদ্ধের প্রক্ষাপট উপস্থিত হলে রাজাদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এই একটি শর্ত ছিল।

১৮০৩ সালে ব্রিটিশরা ওড়িশা জয় করে। ব্রিটিশরা পাইকদের বংশ পরম্পরা জ মি কেড়ে নেয়। ফলে পাইকরা রেগে যায়। ও ব্রিটিশরা নুনের কর বেশি করার কারনে নুনের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারন মানুষের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে ১৮১৭ সালে পাইকরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। এই রিদ্রোহের নেতৃত্বে করেন বকশী জগনবন্ধু বিদ্যাধর।

ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির সেনাবাহিনীতে অনেক ভারতীয় সৈন্য ছিল। কম্পানি তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরন করত। ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় তাদের বেতনও অন্যান্য ভাতা ছিল অনেক কম। ১৮০৬ সালে বেল্লোর ও ১৮২৪ সালে বরাকপুরের বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ ধারন করেছিল।

এসব লড়াই-সংগ্রাম হয়েছে সেসব জায়গায়। তার স্বরুপ ছিল স্থানীয় এবং একাকী। ব্রিটিশরা বল (শক্তি) ব্যবহার করে তাদের দমন করেছিল। জনগনের মধ্যে অসন্তোষ চাপা পড়লেও তা বিনষ্ট হয়নি। ওই দাবানল ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ফেটে পড়ে। ব্রিটিশ কম্পানির কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অনেক জায়গায় সংগ্রাম শুরু হয়। যেমন- বারুদের স্তপে রেখে যাওয়া স্ফুলিঙ্গের মতো এবং তা প্রচন্ড ও সর্বনাশ বিস্ফোরনে বিস্ফোরিত হয় তমনই অবস্থা হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগৃহীত এবং দমন করা অসন্তোষ এই লড়াইয়ের আকারে প্রকট হয় এবং এটি এমন একটি অভূতপূর্ব সশস্ত্র যুদ্ধের আকারে পরিনিত হয়েছিল।

**১৮৫৭ সালের যুদ্ধের কারন :** ব্রিটিশ শাসকদের পুর্বে ভারতে অনেক শাসক শাসন করত। শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন অব্যাহত থাকলেও গ্রাম-জীবন আগের মতোই চলতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশরা প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা করে। গ্রামীন জীবনব্যবস্থা ও প্রকৃতির পরিবর্তন দেখে জনসাধারনের মনে অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার ভাবনা তৈরী হয়েগিয়েছিল।

**আর্থিক কারন :** ব্রিটিশরা আর্থিক আয়বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা শুরু করে। কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে রাজস্ব আদায় করা হইত। ফলে কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ইংল্ডের বাজারের পন্য ভারতে বিক্রী করে আর্থিক সুবিধা লাভ করাই ছিল ব্রিটিশদের নীতি। তাঁরা এখানকার শিল্পের উপর কঠোর কর লাগায়। ভারতের উন্নত হস্তশিল্প ও বস্ত্র শিল্প ফতুর হয়ে যায়। অসংখ্যা ভারতীয় কারীগর শ্রমিক বেরোজগার হয়ে যায়। তাদের মনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়ে চলে।

**সামাজিক কারন :** ভারতীয়রা অনুভব করতে শুরু করে যে ব্রিটিশরা আমাদের রীতিনীতি ঐতিহ্য, এবং পরাম্পরার হস্তক্ষেপ করছে। বিধবা, পুনর্বিবাহের পুন:স্বীকৃতির মতো আইন, যদি সামাজিক ভাবে ন্যায্য, তবুও ব্রিটিশরা আমাদের জীবনযাত্রার বিধিতে হস্তক্ষেপ করছে। ভারতীয়রা এমন ধারনা করেছিল। তাই ভারতীয়রাও অসুন্তষ্ট হয়ে ওঠে।

**রাজনৈতিক কারন :** ১৭৫৭ সাল থেকে ব্রিটিশরা ভারতের অনেক রাজ্য দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে ডালহৌসি বিভিন্ন কারনে বহু রাজ্যকে একীভূত করে নেয়। প্রশাসনহীনতার কারন দেখিয়ে অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসন থেকে অপসারন করে দেয় ও সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে সেখানকার শাসকদের উত্তরাধিকারীদের অধিকার অমান্য করে এই রাজ্যগুলি একীভূত করে নেয়। ডালহৌসির এই নীতির ফলে ভারতীয়দের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিবেশ বেড়ে যায়।

**ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ :** ব্রিটিশ অধিকারীরা ভারতীয় সৈন্যদের সাথে তুচ্ছ ব্যবহার করত। ভারতীয় সৈন্যদের সেনাবাহিনীতে সুবেদারের ঊর্ধ্বে কোনো পদ দেওয়া হইত না। শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের তুলনায় তাদের বেতন কম থাকত। প্রথম দিকে ভারতীয় সৈন্যরাভাতা পেত। সেগুলোও ধীরে-ধীরে কম করে দেয়। এমন অনেক কারনে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে যায়।

**তাৎকালিক কারন :** ব্রিটিশরা ১৮৫৬ সালে ভারতীয় সৈন্যদের দূরপাল্লার অ্যানফিল্ড বন্দুক দেয়। সেগুলোতে ব্যবহৃত কার্তুজের কভার দাঁত দিয়ে খুলতে হতো। এই কভারগুলিতে গরু এবং শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হইত। এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এবং সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

**দাবানল জলে উঠে (বনের আগুন) :** সৈন্যরা যারা চর্বিযুক্ত কার্তুজ ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কারবাই করা হয়েছিল। এবং সেই সৈন্যদের কঠোর শাস্তি দেওয়া

মঙ্গল পান্ডে

হয়েছিল। বারাকপুরের সেনানিবাসে মঙ্গল পান্ডে ব্রিটিশ অফিসারের এই অন্যায় প্রবনতার প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ অফিসারের উপর গুলি চালান। মঙ্গল পান্ডেকে বন্দী করে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। মেরঠ সেনানিবাসে ভারতীয় সৈন্যদের পুরো প্লাটুন বিদ্রোহ করে। সৈন্যরা দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়। মাঝপথে হাজার হাজার মানুষ তাদের সঙ্গে যোগ দেন। ১২ মার্চ ১৮৫৭ সালে সৈন্যরা দিল্লি দখল করে। তাঁরা মুঘল শাসক বাহাদুর শাহ 'জাফর' কে যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ভারতের সম্রাট হিসাবে তার নাম ঘোষনা করা হয়।

**ব্যাপক সংগ্রাম :** দিল্লি দখলের সাথে-সাথে সৈন্যদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানের সৈন্যদেরও অনুপ্রানিত করেছিল। শ্রীঘ্রই এই বিদ্রোহের আগুন উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিহার থেকে রাজপুতানা পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনানিবাসের ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহের পতাকা তুলেছিল। লখনউ, এলাহাবাদ, কানপুর, বেনারস, বরেলি, ঝাঁসিতে বিদ্রোহ শুরু হয়। পরে এই আগুন দক্ষিন ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। নাগপুর, সাতারা, কোলহাপুর নারগুন্দ স্থানে বিদ্রোহ হয়েছিল। এই যুদ্ধে শাহাজী প্রতাপসিং সাতারার ছত্রপতির উত্তরাধিকারী এবং প্রশাসক রঙ্গো বাপু, কোলহাপুরের চিমাসাহেব, নরগগুন্ডের বাবাসাহেব ভাবে, অহমদনগর জেলার সংগমনেরর কাছে ভাগোজী নাইক আদি অগ্রসর ছিল। নাশিক জেলার পেঠ, সুরগানার মহিলারাও সহভাগি হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে খানদেশে কাজারসিং নেতৃত্বে ভিল্লোরা বিদ্রোহ করে। এবং শঙ্করশাহ সাতপুড়া এলাকায় লড়াইয়ের নেতৃত্ব করে। খানদেশের বিদ্রোহে চার শতাধিক ভিল্ল মহিলা অংশগ্রহন করেছিলেন।

**যুদ্ধের নেতৃত্ব :** ১৮ শতকে মুখল সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার পর নাদির শাহ, আবদালীর মতো বিদেশী শাসকরা ভারতে আক্রমন শুরু করে। মুঘল শাসকরা তাদের প্রতিকার করতে পারেনি এই নজরে আসার পর, মারাঠারা বিদেশী আক্রমন থেকে ভারতকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের মাথায় নিয়েছিল। এই ভূমিকাকে লক্ষ রেখে মারাঠারা পানিপথের মাঠে আবদালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধীকারী বাহাদুরশাহ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে যায় এই লক্ষ আসার পর নানাসাহেব পেশওয়া, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই, তাত্যাটোপে ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের লাগাম নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান একতা দেখা যায়। মৌলবী অহমদ উল্লা, কুঁবরসিং, মুখল সেনাপতি বখতখান, বেগম হজর মহল বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব

নানাসাহেব পেশওয়া

তাত্যাসাহেব টোপে

রানী লক্ষ্মীবাই

বেগম হজরত মহল

কুঁবর সিং

করে। দিল্লি, কানপুর, লখনউ, ঝাঁসি এবং পশ্চিম বিহারে বিদ্রোহের স্বরুপ ব্যাপক হয়ে ওঠে।

**বিদ্রোহের প্রতিরোধ :** ব্রিটিশদের সাথে ভারতীয়রা সম্পুর্ণ প্রাণপনে যুদ্ধ করেছে। এতে সৈন্য, জমিদার, রাজা-মহারাজা, সেনাপতি এবং জনসাধারনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয় সৈন্যরা নির্ধারিত সময়ের আগেই বিদ্রোহ প্রারম্ভ করে। প্রথমদিকে ভারতীয় সৈন্যরা সাফল্য পেলেও ব্রিটিশ শক্তির সামরিক সংখ্যা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। ব্রিটিশরাও সাম, দাম, শাস্তি ও বৈষম্যের নীতি অনুসারে বিদ্রোহ দমন করে। ব্রিটিশরা এই আঘাত থেকে অবিলম্বে সামলে যায় এবং পরবর্তী হয় মাষের মধ্যে তারা তাদের হারানো স্থানগুলি ফিরে জয় করে। রানী লক্ষ্মীবাই, কুঁবরসিং, আহমদ উল্লা তাদের জীবন উৎসর্গ করেন। বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুঁনের কারাগারে রাখা হয়েছিল। নানাসাহেব পেশওয়া এবং বেগম হজরত মহল নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন, ও তাত্যা টোপে দশ মাষ প্রর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে কিন্তু বিশ্বাসঘাতার কারনে ধরা পড়ে।

বাহাদুর শাহ

এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এভাবে ব্রিটিশরা ১৮৫৮ সালে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ খুবই কঠোরভাবে নিয়েছিল।

যদিও এই যুদ্ধ ভারতীয় সৈন্যদের অসন্তোষের সাথে শুরু হয়েছিল, তবুও সময়ের সাথে-সাথে কৃষক, কারিগর, সাধারন জনগন, আদিবাসীরা ব্রিটিশদের বিরোধিতায় জড়ো হয়েছিল। সমস্ত ভারতীয় এই অন্যায়কারী শাসনকে সমাপ্ত করার জন্য যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম, বিভিন্ন বর্ণ-গোত্রের মানুষ পূর্ণ শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। ভারত থেকে ব্রিটিশদের তাড়ানোই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ। এর পেছনে ছিল স্বাধীনতার প্রেরনা। এ কারনে এ যুদ্ধ একটি বিস্তৃত জাতিয় স্বরুপ প্রাপ্ত করে।

**যুদ্ধের বিফলতার কারন :** ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ নিম্ন কারনে বিফল হয়।

- **যুদ্ধের প্রসার সম্পূর্ণ ভারতে না হওয়া :** এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে একই সময় শুরু হয়নি। উত্তর ভারতে যুদ্ধের প্রখরতা বেশী ছিল। উত্তরের রাজপুতানা, পাঞ্জাব, বাংলার কিছু অঞ্চল, পুর্ব-উত্তর ভারত এই যুদ্ধ থেকে অলুপ্ত ছিল।

- **উপযুক্ত নেতার অভাব :** এই যুদ্ধে ভারতীয় পর্যায়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ও উপযুক্ত নেতৃত্ব গঠন হয়নি। তাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্য আনা সম্ভব হয়নি।

- **রাজ-রাজাদের সমর্থনের অভাব :** ব্রিটিশ সত্তার আক্রান্ত যেমন সাধারন জনগনের ছিল; তেমন আক্রান্ত রাজ-রাজাদেরও ছিল। তাদের মধ্যে কিছু রাজারা ত্যাগ করলে, অন্যান্য রাজারা ব্রিটিশদের অনুগত ছিল।

- **সৈনিকী কুটনীতির অভাব :** ভারতীয় সৈন্যরা বীরত্ব ও বীরত্বে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তারা সঠিক সময় সঠিক কৌশল ব্যবহার করতে পারে না। দিল্লী জয় করার পর তাহা নিজেদের অধিকারে রাখতে পারেনী। এবং বিদ্রোহীদের কাছে পর্যাপ্ত শস্ত্র-অস্ত্র ছিল না। ব্রিটিশদের কাছে অনেক অর্থশক্তি, অনুশাসনব্ধ সেনাবাহিনী, অধুনিক শস্ত্র-অস্ত্র এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিল। যোগাযোগের ব্যবস্থা তাদের হাতে থাকার কারনে তাদের কাজকর্ম খুব দ্রুত সম্পন্ন হতো। ফলে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের সামনে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। যুদ্ধ শুধু বীরত্বের কারনে নয় সৈনিক কুটনীতি বা কৌশলের ভিত্তিতেও জিততে হয়।

- **আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশদের পক্ষে অনুকুল :** রাশিয়ার সাথে ব্রিটিশদের ক্রিমিয়ান যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়োছিল। এতে ব্রিটিশরা বিজয়ী হয়। বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে তাদের বানিজ্য ছিল। ব্রিটিশদের ছিল শক্তিশালী নৌবাহিনী। তার বিপরীত অবস্থা ছিল বিদ্রোহীদের।

## স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিনাম

**ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির শাসন সমাপ্ত হয় :** কম্পানির কর্তৃত্বের কারনে, ভারতীয়দের অসন্তোষ বেড়ে যায় এবং ব্রিটিশ সত্তার সামনে ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের আহ্বান হয়ে দাড়ায়। এই বোধ ইংল্যান্ডের রানীর হয়। তিনি বুঝতে পারে যে ভারতের ব্রিটিশ সত্তা কম্পানির হাতে সুরক্ষিত নয়। তাই ব্রিটিশপার্লামেন্ট ১৮৫৮ সালে একটি আইন প্রনয়নের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির শাসন ব্যবস্থা সমাপ্ত করে দেয়। গভর্নর জেনারেলের পদের পরিবর্তে ভাইসরয়ের পদ তৈরি করা হয়। ওছাড়াও, ভারতের শাসন পরিচালনার জন্য ইংল্যান্ডের শাসনে ভারতের মন্ত্রী পদ তৈরি করা হয়েছিল।

**রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষনা পত্র :** ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতীয়দের উদ্দেশে একটি ঘোষনাপত্র জারি করেছিলেন। এই ঘোষনায় আস্বাশন দেওয়া হয়েছিল যে সমস্ত ভারতীয় আমাদের প্রজাজন। জাতি, ধর্ম বর্ণ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে মানুষের ভেদাভেদ হবে না। সরকারী চাকরি গুনবত্তার ভিত্তিতে দেওয়া হবে। ধর্মের বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। রাজ-রাজাদের সাথে চুক্তিগুলো অনুসরন বা পালন করা হবে। কোন কারনে ঐ সমস্ত রাজ্যগুলো বিলুপ্ত হবে না, এমন সাক্ষ্য বা ঘোষনাপত্র দেওয়া হয়েছিল।

**ভারতীয় সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন :** সেনাবাহিনীতে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা, বাড়ানো হয়েছিল। মহত্বপুর্ণ পদ ব্রিটিশ অধিকারীদের দেওয়া হয়। কামান সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ অধিকারীদের নিয়ন্ত্রর রাখা হয়। সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে বর্ণ অনুসারে ভাগ করা হয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যরা একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না এমন দক্ষতা নেওয়া হয়েছিল।

**নীতি পরিবর্তন :** ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহন করেছিল। সাথে-সাথে ভারতীয় সমাজ সামাজিক ভাবে একত্রিত হবে না, এই দক্ষতা রাখা প্রারম্ভ হল। জাতি, ধর্ম, বংশ এবং রাষ্ট্রের নামে ভারতীয়দের মধ্য সর্বদা বিবাদ ও দ্বন্দ্ব থাকবে, ভারতীয়দের মন একে অপরের প্রতি কলুষিত হতে থাকবে, এমন নীতি শুরু করেছিল। 'ফুট ডালা এবং রাজ করা' ছিল ব্রিটিশ শাসনের শুত্র।

১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারনে, ভারতীয়দের মনে লাগল যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে বিরোধিতা হওয়া উচিত। ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরনার উৎস হিসেবে প্রমানিত হয়েছিল।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(উমাজী নাইক, স্বাধীনতাসমর, লর্ড ডালহৌসি, ভারতমন্ত্রী, তাত্যাটোপে)

(১) স্বাধীনতাবীর সাবরকর ১৮৫৭ সালে যুদ্ধের নাম .............. দেন।

(২) পিন্ডারিদের সংগঠিত করে .............. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

(৩) ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের পর ভারতের শাসন পরিচালনার জন্য .............. পদ ইংল্যান্ড সরকার তৈরী করে।

(৪) ভারতের রাজ্যগুলি .............. গর্বানারের দ্বারা একীভূত হয়েছিল।

**২. নিচের বক্তব্যগুলো কারনসহ ব্যাখ্যা কর।**

(১) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পাইকরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল।

(২) হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

(৩) ভারতীয় সৈন্যারা ব্রিটিশদের সামনে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

(৪) স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে, ভারতীয় সৈন্যদের ইউনিটগুলিকে বর্ন অনুসারে বিভক্ত করা হয়েছিল।

(৫) ব্রিটিশরা ভারতীয় শিল্পের উপর কঠোর কর লাগায়।

**৩. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখ।**

(১) ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে সামাজিক কারনগুলো কী ছিল?

(২) ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয়রা বিফল হয়েছিল কেন?

(৩) ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল লেখ?

(৪) ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা কী নীতি পরিবর্তন করেছিল?

**উপক্রম**

(১) স্বাধীনতাবীর সাবরকরের 'স্বতন্ত্র সমর' বইটি পাপ্ত করো এবং পঠন করো।

(২) ভারতের মানচিত্রের ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্থানগুলো দেখাও।

# ৫. সামাজিক ও ধার্মিক, পুনর্জাগরন

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে নুতন বিচার, নুতন কল্পনা, নুতন দর্শনের প্রসার হয়েছে। এই ভাবে পশ্চিমী বিচার, সংস্কৃতির ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় সমাজের সামাজিক, ধার্মিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে।

ভারতীয় সমাজের পশ্চাৎপদতা তাদের কুসংস্কার, রক্ষণক্ষীলতা, জাতিভেদ, উঁচু-নিচুতার বিভ্রান্ত কল্পনা, মনোযোগী ও চিকিৎসক বৃত্তির অভাব রয়েছে, ইহার জ্ঞান শিক্ষিত সমাজদের হোতে লাগল। দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয় সমাজে ব্যপ্ত দোষ ও অনিষ্ট প্রবৃত্তি মূল থেকে নষ্ট করা এবং মানবতা, সমতা, বন্ধুতার উপর ভিত্তিক নুতনসমাজ নির্মিতি করার প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় সমাজে ব্যপ্ত বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে শিক্ষিত, বিচারক নিজেদের লেখনী দ্বারা জনজাগরন করতে লাগল। তৎকালীন ভারতে প্রারম্ভ হওয়া এই বৈচারিক জাগরনকে 'ভারতীয় পুনর্জাগরন' বলা হয়।

## ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের যুগ

**ব্রাহ্ম সমাজ :** রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে বাংলা প্রান্তে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনা করেন। তিনি অনেক ভাষা এবং ধর্মের অধ্যয়ন করেছিলেন। এর মধ্য থেকে তাহার অদ্বৈতবাদী বিচারধারা বিকাশিত হয়। একেশ্বরবাদ, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ না করা, আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা, প্রার্থনার পথ অনুসরন করা ইত্যাদি ব্রাহ্ম সমাজের নীতি ছিল। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ, পর্দা পদ্ধতির বিরোধ করেন। বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষার সমর্থন করেন। কোলকাতায় হিন্দু কলেজ (মহাবিদ্যালয়) স্থাপনা করেন। একইভাবে 'সম্বাদ' কোমুদী' এই সংবাদপত্র দ্বারা জনজাগরন করেন।

রাজা রামমোহন রায়

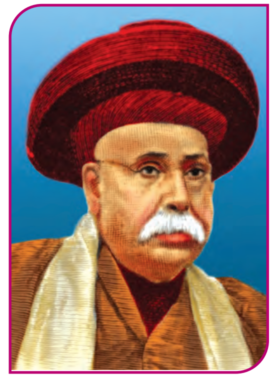

দাদোবা পান্ডুরং তর্খডকর

**প্রার্থনা সমাজ :** দাদোবা পান্ডুরং তখর্ডকর ১৮৪৮ সালে মুম্বাইতে পরমহংস সভাস্থাপনা করেন। পরবর্তীতে পরমহংস সভা বিলুপ্তির পর তারই কিছু সদস্যরা প্রার্থনা সমাজ স্থাপনা করে। দাদোবার বন্ধু ডা.আত্মারাম পান্ডুরং প্রার্থনা সমাজের প্রথম অধ্যক্ষ পান্ডুরং প্রার্থনা সমাজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলো। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব স্নাতক এই সংস্থায় যুক্ত হওয়ার কারনে ইহার প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি পায়।

প্রার্থনা সমাজের কাজ ন্যায়মূর্তি মহাদেব গোবিন্দ রানডে, ডা.বা.গো.ভান্ডারকর পরবর্তীতে চালায়। মূর্তি-পুজার বিরোধ একেশ্বরবাদ, আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা প্রার্থনা সমাজের কিছু সিদ্ধান্ত ছিলো। তারা উপাসনা এবং প্রার্থনার উপর বিশেষ জোর দিতো। প্রার্থনা সমাজ সমাজ সুধারের জন্য অনাথালয়, নারী শিক্ষা সংস্থা, শ্রমিকদের জন্য রাতের পাঠশালা, দলিতদের জন্য সংস্থা প্রারম্ভ করেছে। প্রার্থনা সমাজের সদস্য মহর্ষি বিঠ্ঠল রামজী শিন্দে 'ডিপ্রেস্ত ক্লাসেস মিশনের' স্থাপনা করে তার দ্বারা সামাজিক সমস্যগুলির সমাধান করতে প্রচেষ্টা করেছে।

**সত্যশোধক সমাজ :** মহাত্মা জোতীরাও ফুলে ১৮৭৩সালে সত্যশোধক সমাজের স্থাপনা করেছে। সত্যশোধক সমাজ সমতা নীতির উপর ভিত্তিক সমাজ নির্মানের কাজ করেছে। তারা অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরোধ করে। তারি সঙ্গে তারা বহুজন সমাজের শিক্ষা এবং নারী শিক্ষার সমর্থন করে।

মহাত্মা জোতীরাও ফুলে 'ব্রাহ্মনের কসব' ব্রোহ্মণদের (কৌশল) 'গুলামাগিরী', শেতকরাঞ্চা আসুড' (কৃষকদের চাবুক) 'সার্বজনিক সত্যধর্ম' এইরূপ বইয়ের মাধ্যমে সমাজে পুনর্জাগরন করেছে। নারী-পুরুষ অথবা মানুষ-মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করা রীতিনীতির কঠোর সমালোচনা করেন।

মহাত্মা জোতীরাও ফুলে

**আর্য সমাজ :** স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী ১৮৭৫ সালে আর্য সমাজ স্থাপনা করেন। বেদের উপর ভাষ্য করা সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থ লিখেছে। প্রাচীন বৈদিক ধর্মই সত্য ধর্ম তাহাতে জাত-পাতের স্থান ছিল না। নারী-পুরুষ সমানতা ছিল এইরূপ প্রতিপাদিত করেন। 'বেদের দিকে চলো' এটা আর্য সমাজের প্রবাদ বাক্য ছিল। আর্য সমাজের সম্পূর্ণ ভারতে শাখা খোলা হয়। আর্য সমাজের মাধ্যমে স্থানে-স্থানে শিক্ষা সংস্থা খোলা হয়।

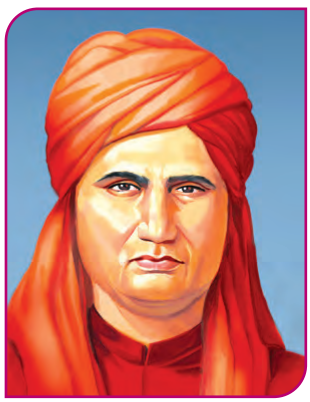
স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী

**রামকৃষ্ণ মিশন :** রামকৃষ্ণ পরমহংসদেদের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন মানুষ সেবার অনেক কাজ করে। এই মিশন অকালগ্রস্তদের সাহায্য পৌছানো, নারীশিক্ষা, আধ্যাত্মিক উন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মিশন কাজ করেছে এবং আজও করছে। স্বামী বিবেকানন্দ উত্তম বক্তা ছিলেন। তিনি ১৮৯৩ সালে অমেরিকার শিকাগো শহরে আয়োজীত বিশ্বধর্ম পরিষদে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ভারতের যুবদের 'উঠো, জাগো ও লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।'' এই বার্তা দিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

**শিখ সমাজে সুধারনা :** শিখদের মধ্যে ধর্ম সুধারনার জন্য অমৃতসরে 'সিংসভার' স্থাপনা হয়। এই সংস্থা শিখ সমাজে শিক্ষা প্রসার ও আধুনিকীকরনের কাজ করেছে। সময়ের সাথে-সাথে 'অকালী আন্দোলন' শিখ সমাজের সংস্কারবাদী ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

**নারী বিষয়ক সুধারনা :** যখন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার ঘটে তখন ভারতে নারীদের অবস্থা খুবই দয়নিওদশা ছিল। তাদের শিক্ষা গ্রহন করার অধিকার ছিল না। তাদের সাথে সমান ভাবে ব্যবহার করা হতো না। সমাজে বাল্যবিবাহ, বৃদ্ধ-কুমারী বিবাহ, যৌতুক প্রথা, সতীদাহ প্রথা, কেশবপন, বিধবা বিবাহের বিরোধ এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালীন গভর্নর লার্ড বেন্টিককে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ আইন তৈরি করার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের মতো সমাজ সুধারক সহযোজিতা করেন। গোপাল হরি দেশমুখ ওরফে লোকহিতবাদী শতপত্র দ্বারা নারী-পুরুষ সমানতার অসমর্থন করেন।

গোপাল হরি দেশমুখ

১৮৪৮ সালে মহাত্মা ফুলে পুনার ভিডে বাড়ায় মেয়েদের প্রথম পাঠশালা শুরু করে। এই কাজে তার নিজের স্ত্রী সাবিত্রীবাইয়ের সহয়োগিতা প্রাপ্ত হয়। সমাজে আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা লোকদের সমালোচনা, নিন্দা সহ্য করেও সাবিত্রীবাই ফুলে শিক্ষা প্রদানের কাজ শুরু রাখে। মহাত্মা ফুলে নিজের ঘরে শিশু হত্যা প্রতিরোধ মূলক গৃহ স্থাপনা করেন। কেশবপানের (কেশমুন্ডন)

সাবিত্রীবাই ফুলে

পদ্ধতি বন্দ হোক, এর জন্য তিনি পরামানিকদের দ্বারা হরতাল করিয়েছেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের স্বীকৃতি প্রাপ্ত করিয়ে দেওয়ার জন্য পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিষ্ণুশাস্ত্রী পন্ডিত ও বীরেশলিঙ্গম পন্তলু এনারা বিশেষ প্রচেষ্টা করেছেন। গোপাল গনেশ আগরকর নিজের 'সুধারক' সংবাদপত্র দ্বারা বাল্যবিবাহ আইন বিষয় নিজের স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেছেন। মহর্ষি বিঠ্ঠল রামজী শিন্দে মুম্বাইতে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে পরিষদের আয়োজন করিয়েছেন। তারাবাই শিন্দে 'নারী-পুরুষ তুলনা' গ্রন্থ দ্বারা অত্যন্ত জ্বলন্ত এবং কঠোর ভাষায় মহিলাদের অধিকারের সমর্থন করেছেন। মহর্ষি ধোন্ডো কেশব কর্বে পুনায় 'অনাথ বালিকাশ্রম' প্রারম্ভ করেন। বিধবা পরিত্যাজ্যদের সাথে-সাথে সকল মহিলারা শিক্ষাগ্রহন করে আত্যনির্ভরশীল হবে এই তার উদ্দেশ্য ছিল। তানারা প্রচেষ্টার ফলেই ভারতে কুড়ি শতাব্দীর প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়। পন্ডিতা রমাবাই 'শারদাশ্রম' সংস্থা স্থাপনা করে বিকলাঙ্গ ছেলে-মেয়ে ও মহিলাদের পালন পোষনের দায়িত্ব গ্রহন করেন। রমাবাই রানডে 'সেবাসদন' সংস্থার মাধ্যমে মহিলাদের জন্য পরিচারিকা (নর্স) পাঠ্যক্রম শুরু করেন। মহিলারা ভোটের অধিকার পাওয়া উচিৎ এর জন্য তিনি সরকারের কাছে চাহিদা করেন। ডা.বাবাসাহেব আম্বেডকর নিজ লেখনের মাধ্যমে মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচারকে বানী প্রদান করেন। মহাত্মা গান্ধী নারী শিক্ষার অসমর্থন করেন। মহিলারা স্বাধীনতার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য যোগদান দিয়েছিল।

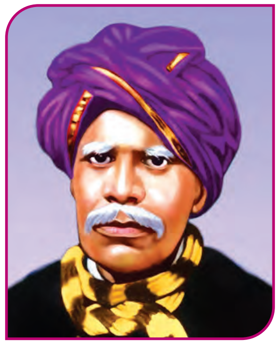

বিরেশলিঙ্গম পন্তলু

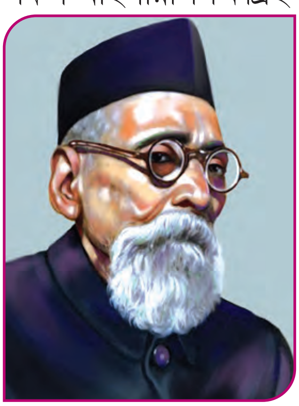

মহর্ষি ধোন্ডো কেশব কর্বে

নারী সুধার আন্দোলনের ফলে সমাজ প্রচলিত অনিষ্ট এবং অন্যায়কারী প্রথাগুলি বন্দ হওয়ায় সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে। মহিলারা নিজ বিচার লেখন দ্বারা ব্যক্ত করতে লাগল। শিক্ষার ফলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের কাজ প্রস্ফুটিত হতে লাগল।

**একটু চিন্তন করো :**

- যদি সমাজ সুধারকেরা নারী শিক্ষা শুরু না করতো তবে...
- শিক্ষার কারনে বর্তমান সময় মহিলাদের জীবনে কি পরিবর্তন হয়েছে ?
- তোমাদের কি লাগে যে আজও নারী শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন আছে? যদি হাঁ তাহলে কিরূপ প্রচেষ্টা করা উচিৎ?

**মুসলিম সমাজে সুধার আন্দোলন :** আব্দুল লতিফ মুসলিম সমাজে ধর্ম সুধার প্রারম্ভ করে। তিনি বাংলা প্রান্তে 'দ মুহম্মদন লিটরেরী সোসাইটী' সংস্থা স্থাপনা করে। সর সৈয়দ অহমদ খাঁ 'মুহম্মদন অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল মহাবিদ্যালয়' স্থাপনা করে। কালান্তরে এই মহাবিদ্যালয় অলীগঢ় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তীত হয়। তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞান ও তন্ত্রজ্ঞানের অসমর্থন করেন। মুসলিম সমাজ যে পর্যন্ত পশ্চিমী শিক্ষা ও বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন না করবে ততখন পর্যন্ত তাদের উন্নতি সম্ভব না ইহা তানার দৃঢ় মত ছিল।

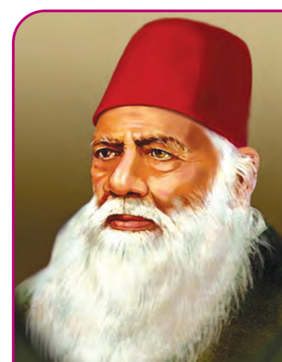

সর সৈয়দ অহমদ খাঁ

**হিন্দু সমাজে আন্দোলন :** হিন্দু সমাজ যাতে সম্মানের স্থান পায়; এর জন্য ১৯১৫ সালে 'হিন্দুমহাসভা' সংগঠনের স্থাপনা হয়। পন্ডিত মদন মোহন মালবীয় 'বনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভিত্তি স্থাপন করেন। ডা.কেশব বলিরাম হেডগেবার ১৯২৫ সালে নাগপুরে 'রাষ্ট্রীয়' (জাতীয়) স্বয়ং সেবক সংঘ 'স্থাপনা করেন' হিন্দুত্ববাদী যুবদের অনুশাসনবদ্ধ ও চরিত্রসম্পন্ন সংগঠন গড়ে তোলা এই তানার উদ্দেশ্য ছিল। স্বতন্ত্রবীর বি.দা.সাবরকর রত্নাগিরীতে পতিত

পাবন মন্দির নির্মান করেন। যেখানে হিন্দু ধর্মের সকল জাতীয় লোকদের বিনামূল্য প্রবেশ দেওয়া হতো। সহভোজনের অনুষ্ঠান চালায়।

ডা.কেশব বলীরাম হেডগেবার

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে পুনর্জাগরনের এই অভিব্যক্তি খুবই মহত্বপুর্ণ। স্বাধীনতা, সমতা, জাতীয়তাবাদ এইরূপ বিচারধারায় অভিভূত সুধারকেরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশব্যাপী আন্দোলন দাড় করেছেন। ইহার অধ্যয়ন আমরা পরবর্তী পাঠে করবো।

### তুমি জানো কি ?

**পুনর্জাগরনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আবিস্কার :** সুধার আন্দোলনের মতোই পুনর্জাগরন কালে সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হওয়া উন্নতি ও খুবই মহত্বপুর্ণ ছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সী.ভি. রামন এনারা নোবেল পুরস্কার (উপহার) পেয়েছে। এর ভিত্তিতে ভারতের উন্নতির কল্পনা করা যায়। এই উন্নতির ফলে আধুনিক ভারতের নির্মান হয়। গল্পসমূহ উপন্যাস দ্বারা স্বাধীনতার প্রেরনা প্রাপ্ত হোতে লাগল। সমাজ সুধারের বিচার ও ব্যক্ত (প্রকাশ) হোতে লাগল।

এই সময় মহিলারাও লেখন করতে লাগল। নুতন সংবাদপত্র ও ম্যাগজিন সমাজ সুধার এবং রাজনৈতিক জাগরনের সাধন হয়ে দাড়ায়।

এই সময় শিল্পকলা ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়। সঙ্গীত অধিকাধিক লোকভিমুখ হতে লাগল। ভারতীয় শৈলী ও পশ্চিমী কৌশলের মিলনে নুতন চিত্রকলার উদয় হয়।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বই লিখিত হতে লাগল। ভারতের উন্নতির জন্য প্রয়োগশীলতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোনের যে মহত্ব ইহার জ্ঞান জনগনদের হোতে লাগল।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(সর সৈয়দ অহমদ খাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি বিঠ্ঠল রামজী শিন্দে)

(১) ........... 'রামকৃষ্ণ মিশানের' স্থাপনা করেন।

(২) ............. মুহম্মদন অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের স্থাপনা করেন।

(৩) 'ডিপ্রেস্ত ক্লাসেস মিশনের' স্থাপনা ............. ইনি করেন।

**২. নিম্ন তালিকা পূর্ণ করো।**

| সমাজ সুধারকের নাম | সংস্থা | সংবাদপত্র / বই | সংস্থার কাজ |
|---|---|---|---|
| রাজা রামমোহন রায় | .......... | সম্বাদ কৌমুদী | ........ |
| ............. | আর্য সমাজ | ........... | ........ |
| মহাত্মা ফুলে | ........... | গুলামগিরী | ........ |

**৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।**

(১) ভারতে সামাজিক, ধার্মিক পরিবর্তনের আন্দোলন শুরু হয় ?

(২) মহাত্মা ফুলে পরামানিকদের দ্বারা হরতাল করিয়েছেন ?

**৪. টিপ্পনী (নোট) লেখো।**

(১) রামকৃষ্ণ মিশন

(২) সাবিত্রীবাই ফুলের নারীবিষয়ক সুধার কাজ

**উপক্রম**

(১) 'নারী শিক্ষা' বিষয় বিদ্যালয়ে রচনার প্রতিযোগিতা আয়োজন করো।

(২) সমাজ সুধারকদের ছবি সংগ্রহ করো।

# ৬. স্বাধীনতা আন্দোলন যুগের প্রারম্ভ

ইংরেজী শিক্ষার ভারতীয় সমাজ জীবনে মিশ্রিত পরিনাম হয়েছে। নবশিক্ষিত সমাজ যে পুনর্জাগরনের কাজ প্রারম্ভ করেছে; তার ফলে জাতীয়তাবাদী ভাবনার বীজ রোপন হয়েছে। ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে চলা আন্দোলনের কারনে বিভিন্ন প্রান্তে রাজনিতিক সংস্থার এক সূত্র তৈরি করা, রাজনিতিক রূপে জাগ্রত বিভিন্ন দল ও লোকদের একত্রিত করা এবং জাতীয় হিতের সমস্যার দিকে লোকদের লক্ষ্য আকৃষ্ট করে জাতিয় আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্ত করার জন্য সম্পূর্ন ভারতীয় স্তরে এক রাজনৈতিক সংগঠন দাড় করবার প্রয়োজন ছিল এবং তার জন্য অনুকূল পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল।

**ব্রিটিশ শাসনকালে প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরন :** ব্রিটিশ প্রশাসনের ফলে ভারতে প্রকৃত অর্থে একছত্র শাসন প্রারম্ভ হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশে সমান নীতি, আইন সম্মুখে সকলে এক সমান এই সকল কারনের জন্য লোকেদের মধ্যে এক জাতীয়তার ভাবনা গড়ে ওঠে। ব্রিটিশেরা নিজেদের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এবং সেনাবাহিনীর দ্রুত গতিবিধির জন্য রেল, রাস্তার জাল বিছালো। কিন্তু এই ভৌতিক সুবিধার লাভ ভারতীয়দেরও হয়। ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন প্রান্তের লোকদের মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধ বাড়ে এবং তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বৃদ্ধি হয়। তারই সঙ্গে জাতীয় ভাবনা বাড়তে লাগল।

**আর্থিক শোষন :** ভারতের সম্পত্তির প্রবাহ একাধিক উপায়ে ইংল্যান্ডের দিকে প্রবাহিত হতে লাগল। ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারনে ভারতের আর্থিক শোষন হতে লাগল। কৃষকদের জোর করে নগদ অথবা বানিজ্যিক ফসল নেওয়ার জন্য বাধ্য করা, খাজনার বোঝা, নিরন্তর আসা অকানের কারনে ভারতীয় কৃষকদের মেরুদন্ডের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। গতানুগতিক শিল্প-ব্যবসা পতনের কারনে বেকারত্ব বেড়ে গিয়েছে। পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিক বর্গের শোষন করা হচ্ছিল। মধ্যম বর্গের উপর নুতন-নুতন খাজনা লাগানো হচ্ছিল। ফলে জনগনের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বলছিল।

**পশ্চিমী শিক্ষা :** পশ্চিমী শিক্ষার প্রসারের কারনে বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং গনতন্ত্র এইরূপ নুতন সংকল্পনাগুলির সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় হয়। ভারতীয়রা বুদ্ধিমত্তা, অখন্ডতা, মানবতা, জাতীয়তাবাদ এইরূপ মূল্য আত্মসাৎ করে। আমাদের দেশের শাসন চালাতে আমরা সক্ষম হই এবং এই মূল্যের ভিত্তিতে আমাদের দেশের উন্নতি সাধ্য করা উচিৎ। এই ভাবনা দৃঢ় হোতে লাগল। বিভিন্ন ভাষা সম্পন্ন ভারত দেশে ইংরেজী ভাষার কারনে যোগাযোগের একটি নুতন মাধ্যম প্রাপ্ত হয়।

**ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যয়ন :**

ডা.ভাউ দাজী লাড

কোলকাতায় ব্রিটিশেরা 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপনা করে। অনেক ভারতীয় এবং পশ্চিমী পন্ডিতেরা ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন প্রারম্ভ করেন। সংস্কৃত, ফারসী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ পান্ডুলিপিগুলির অনুসন্ধান করে তার উপর গবেষনা প্রকাশিত করে। ডা.ভাউ দাজী লাড, ডা.রা.গো.ভান্ডারকর এইরূপ কিছু ভারতীয় পন্ডিতেরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর অধ্যয়ন করেন। আমাদের প্রাচীন সমৃদ্ধ ঐতিহ্য প্রাপ্ত রয়েছে, ইহার জ্ঞান হওয়াতে ভারতীয়দের মধ্যে অস্মিতা জেগে উঠল। পুনায় 'ভান্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির' এই সংস্থা গত একশত বছর ধরে কাজ করছেন।

ডা.রা.গো.ভান্ডারকর

**সংবাদপত্রের কাজ :** এই সময় ইংরেজী এবং আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে লাগল। এই সংবাদপত্র দ্বারা রাজনৈতিক ও

সামাজিক জনজাগরন হতে লাগল। দর্পন, প্রভাকর, হিন্দু, অমৃত বাজার পত্রিকা, কেসরী, মরাঠা ইত্যাদি সংবাদপত্র দ্বারা সরকারী নীতির সমালোচনা হতে লাগল।

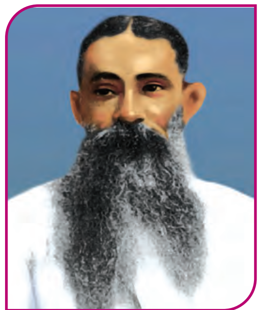
ব্যোমেশচন্দ্র ব্যানার্জী

**ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্থাপনা :** ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ সালে মুম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত পাঠশালায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আয়োজিত করা হয়েছিল। এই অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিল। কোলকাতার বিখ্যাত উকিল ব্যোমেশচন্দ্র ব্যানার্জী এই অধিবেশনের অধ্যক্ষ ছিল। এনারা সকলে মিলে এই সভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেসের) স্থাপনা করেন। ব্রিটিশ অধিকারী এলন অক্টেভিয়ান হিউম জাতীয় কংগ্রেসের স্থাপনায় এগিয়ে এসেছিলেন। প্রশাসনে ভারতীয়দের বেশি প্রতিনিধিত্ব পাওয়া উচিৎ, ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনীর ব্যয়কম করা উচিৎ সরকারের কাছে এইরূপ দাবি জানানো হয়।

**জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য :** ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা, ভৌগলিক প্রদেশ ইত্যাদির বৈষম্য ভূলে এক মঞ্চে আনা, একে অপরের সমস্য জেনে নিয়ে সমস্যার সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনা করা, জনগনের মধ্যে ঐক্য ভাবনার বৃদ্ধি করা, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করা ইত্যাদি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল।

**নরম দল (১৮৮৫ থেকে ১৯০৫):** জাতীয় সভার স্থাপনার পর প্রারম্ভিক দশকে তাদের কাজ ধীর গতিতে কিন্তু অনবরতভাবে চলতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা বাস্তবসম্মত ও উচ্চ শিক্ষিত ছিল। তাদের উপর পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের উদার নীতি এবং স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্বের মতো মূল্যের প্রভাব ছিল। তারা আইনের পথে চলতে বিশ্বাস করতো। আইনের পথে চলে দাবী রাখলে ব্রিটিশ আমাদের দাবীতে উচিৎ ন্যায় প্রদান করবে এই তাদের আশা ছিল। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, ফিরোজ শাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী নরম দলের নেতা ছিল।

প্রাদেশিক আইন বোর্ডে জনপ্রতিনিধি থাকা উচিৎ, শিক্ষিত ভারতীয়রা চাকরী পাওয়া উচিৎ; ক্রমে জনগনের আইনগত অধিকার রক্ষার্থে কার্যনির্বাহী সংস্থা এবং ন্যায় সংস্থা ভিন্ন-ভিন্ন (আলাদা) করা হোক এইরূপ বিভিন্ন প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা অধিবেশনে রেখেছিল।

জাতীয় আন্দোলনে ভাঙ্গন ডালার জন্য আগে চলে ব্রিটিশেরা 'ফুট ডালো রাজ করো' নীতি অনুসরন করে।

**গরম দল (১৯০৫ থেকে ১৯২০) :** ভারতের যে সকল নেতার রাজনৈতিক দৃষ্টিতে জাগ্রত ছিল তাহার সকলে নিজ জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং প্রান্ত ভুলে গিয়ে জাতীয় কংগ্রসের মঞ্চে একত্রিত আসতে শুরু করেছিল। জাতীয় কংগ্রসের উদ্দেশ্য এবং আইন সম্মত ভাবে আন্দোলন আগে নিয়ে যাওয়ায় তাদের সকলের একমত ছিল। তা সত্ত্বেও আন্দোলনের কার্য পদ্ধতি নিয়ে এই সকল নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। এই মতপার্থক্য একটি তাত্ত্বিক স্বরূপের ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে উৎপন্ন এই মতপার্থকের ভিত্তিতে দুটি প্রমুখ রাজ নৈতিক দল তৈরি হয়ে যায়। শান্তিপূর্ণ ও আইন পথ অনুসরনকারী নেতাদের নরম পন্থী হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং স্বাধীনতার জন্য প্রখর সংগ্রাম করা উচিৎ এইরূপ বিচার সম্মত নেতাদের গরম পন্থীনেতা বলা হতো। লালা লজ পতরায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল এনাদের গরম পন্থীর নেতা মানা হতো।

লোকমান্য তিলক

প্রারম্ভিক সময়ে গরম পন্থীর নেতারা ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য সংবাদ পত্র, জাতীয় উৎসব এবং জাতীয় শিক্ষার পথ অবলম্বন করেছিল। লোকমান্য তিলক 'কেসরী ও মরাঠা' সংবাদ পত্র দ্বারা সরকারের কটু সমালোচনা করে। বাংলা প্রান্তে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' গরম পন্থী বিচার ধারার মুখপত্র ছিল। পারস্পরিক মতপার্থক্য ভুলে লোকেরা একত্রিত আসবে, তাদের

মধ্যে ভাবনার আদান-প্রদান হবে এবং রাষ্ট্রপুরুষদের কার্য দ্বারা সাধারন লোকদের মধ্যে অনুপ্রেরনা জাগে এই উদ্দেশ্য নিয়ে লোকমান্য তিলক শিবজয়ন্তী এবং গনেশপুজা এই উৎসব আয়োজিত করান। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে লোকে একত্রিত হলে সরকার তাদের উপর বন্দী লাগাবে। কিন্তু ধার্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে লোক একত্রিত হলে সরকার তাদের উপর বন্দী লাগাতে পারবে না; এই তার ভাবনা ছিল। লোকমান্য তিলক মন্ডালের কারাগরে 'গীতারহস্য' গ্রন্থ লেখে। এই গ্রন্থের সারমর্ম কর্মযোগ ছিল এবং লোকেরা ও কর্মরত থাকবে এর উপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। নিজ ভাষা, নিজ সংস্কৃতির প্রতি প্রেম, বিশ্বাস রাখা সমাজ তৈরি করার জন্য গরম পন্থী নেতারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে। গরম পন্থী নেতাদের মতামত এই ছিল যে লক্ষ্য-লক্ষ্য লোক স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্মিলিত হয়ে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে, তাহলেই সফলতা পাওয়া যাবে। আন্দোলন অধিক তীব্র করা উচিৎ; ইহাতে সকলের একমত ছিল। কিন্ত তাহারা দৃঢ়তাপুর্বক নিশ্চয় করল যে এর জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের ভূমিকা না নিয়ে ব্যাপক জন আন্দোলন করা উচিৎ। নরম পন্থীর নেতারা আন্দোলনের আধারশিলা রেখেছিল এবং গরম পন্থীর নেতারা এই আন্দোলন আগে নিয়ে যায়।

১৮৯৭ সালে পুনায় প্লেগ এই মহামারী হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছিল। শত-শত মানুষ মারা গিয়েছিল। এই মহামারী নিয়ন্ত্রনের জন্য রেড নামের অধিকারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্লেগের রুগী খোঁজ করে বের করার জন্য তালাশি অভিযান প্রারম্ভ করা হল। জনগনের উপর অন্যায়-অত্যাচার করা হয়। এর প্রতিশোধ নিতে চাফেকর ভাইয়েরা তাকে হত্যা করে। সরকার লোকমান্য তিলকের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধ জুড়তে খুব প্রচেষ্টা করে কিন্তু সফল না হওয়া সত্বেও সরকার প্রতিশোধনিতে লোকমান্য তিলক কে কারাগারে বন্ধি করে।

**বাংলার বিভাজন :** হিন্দু মুসলিম সমাজ বিভাজনের বীজ বপন করে, 'বিভাজন করো ও রাজ্য করো' এই নীতির সমর্থন করতে ব্রিটিশেরা নিশ্চয় করে। তৎকালীন ভাইসরায় লার্ড কর্জন আগুনে ঘী ঢেলে দেওয়ার কাজ করেছে। বাংলা একটি বৃহৎ প্রান্ত ছিল। এই প্রান্তের শাসন চালানো প্রশাসনিক দৃষ্টিতে কঠিন এই কারন দেখিয়ে লার্ড কর্জন ১৯০৫ সালে বাংলার বিভাজনের ঘোষনা করে। এই বিভাজন অনুসারে মুসলিম বহু সংখ্যকদের পূর্ব বাংলা এবং হিন্দু বহুসংখ্যাকদের পশ্চিম বাংলা এইরূপ ভাবে বিভাজন করা হলো। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করা বিভাজন নীতির গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল।

**বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন :** শুধু বাংলায় নয়, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে বিভাজনের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হয়েছিল। ১৬ অক্টোবর এই বিভাজনের দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ভারতে নিষেধ সভা দ্বারা সরকারের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়। সব জায়গায় 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া শুরু হয়। একতার প্রতীক রূপে রক্ষাবন্ধন উপক্রম আয়োজিত করা হয়। সরকারী বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে প্রচুর মাত্রায় ছাত্ররা/শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলনে সম্মিলিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দ মোহন বোস, রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কারনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিস্তার বেড়ে যায়। এখন এটি একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিনত হলো। অসন্তোষের তীব্রতা দেখে ১৯১১ সালে ব্রিটিশেরা বাংলা বিভাজনের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেয়।

**জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্সূত্রী :** ১৯০৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের অধ্যক্ষ নামদার গোখলে ছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থন করেন। ১৯০৬ সালে অধিবেশনের অধ্যক্ষ দাদাভাই নৌরোজী ছিলেন। দাদাভাই নৌরাজী মঞ্চের থেকে 'স্বরাজ্য' শব্দের প্রথমবার উচ্চারন করেন। তিনি নিজের অধ্যক্ষিয় বক্তব্য দ্বারা এই বার্তা দেয় যে একতাবদ্ধ হও, প্রানপনে সংগ্রাম করো এবং স্বরাজ্যের লক্ষ্য অর্জন করো, যার দ্বারা আজ যে লক্ষ-লক্ষ ভাই দারিদ্র, অনাহার এবং রোগের শিকার হচ্ছে তাদের বাঁচানো সম্ভব হবে এবং উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে ভারত

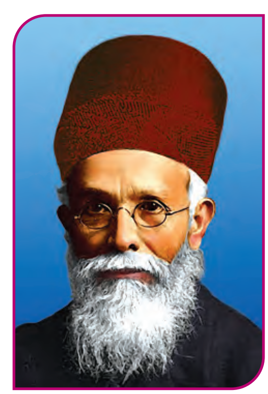

দাদাভাই নৌরোজী

দেশের যে সম্মানের স্থান প্রাপ্ত ছিল; তাহা পুনরায় যেন প্রাপ্ত হয়। এই অধিবেশনে স্বরাজ্য, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা এবং বহিস্কার এই চতুর্সূত্রকে জাতীয় কংগ্রেস একমতে স্বীকার করে। স্বদেশী আন্দোলনের কারনে আমরা স্বয়ংপূর্ন ও স্বাবলম্বী তৈরী হবো। স্বদেশী মার্গে চলার জন্য আমাদের দেশের পুঁজি, সম্পদ, জনশক্তি এবং অন্য সকল শক্তি আমাদের একত্রিত করতে হবে এবং এর মাধ্যমে আমরা দেশের কল্যান সাধ্য করতে পারব। বিদেশী বস্তু এবং জিনিস পত্রের বহিস্কার করা হল। প্রথম পদক্ষেপ এবং বিদেশী শাসনের বহিস্কার করা পরবর্তী পদক্ষেপ হবে। বহিস্কার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলে আঘাত করা সম্ভব এটা ভারতীয় নেতাদের ভাবনা ছিল।

**তুমি জানো কি ?**

নামদার গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯০৫ সালে 'ভারত সেবক সমাজের' স্থাপনা করেন। জনগনের মধ্যে দেশভক্তির ভাবনা নির্মাণ করে স্বার্থত্যাগের শিক্ষা দেওয়া, ধর্ম এবং জাতির মধ্যে বিরোধ নষ্ট করা এবং সামাজিক সম্প্রীতি নির্মাণ করা, শিক্ষা প্রচার করা ইত্যাদি ভারত সেবক সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

**গরম এবং নরম পন্থিদের মধ্যে মত-পার্থক্য :** ১৯০৭ সালে সুরতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের এই দুই, পন্থীর মধ্যে বৈচারিক মতপার্থক্য চূড়ান্তে পৌছে যায়। নরম পন্থীর প্রচেষ্টা এই ছিল যে স্বদেশী এবং বহিস্কারের প্রস্তাবকে আলাদা রাখা হোক কিন্তু গরম পন্থীর প্রচেষ্টা এই ছিল যে তাদের এই প্রস্তাব সফল না হয়। নরম পন্থীর নেতা না.গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ফিরোজ শাহ মেহতা গরম পন্থীর নেতাদের উপর অভিযোগ করে যে গরমপন্থীর নেতারা জাতীয় কংগ্রেসকে নিজেদের অধিকারে এবং নিয়ন্ত্রনে করে নিতে চায়। লালা লাজপত রায় মধ্যস্থতা করতে প্রচেষ্টা করেন। তিলকের অভিমত ছিল যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি জাতীয় মঞ্চ এবং তাহাতে ভাঙ্গন পড়া উচিৎ না। অধিবেশনের সময় বিবাদ এতো বেড়ে যায় যে সমঝোতা করা অসমম্ভব হয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যায়।

**বিট্রিশ সরকারের দমন নীতি :** বঙ্গভঙ্গের পর শুরু হওয়া প্রভাবী জনআন্দোলন দেখে সরকার অস্থির হয়ে উঠে। এই আন্দোলন থামাবার জন্য সরকার দমননীতি অনুসরন করে। আইন দ্বারা সার্বজনিক সভা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আইন সামান্যকারীদের কঠোর শাস্তি ছাত্রীদের মারধর করা হয়। সংবাদপত্রের উপর বিভিন্ন প্রকারের বন্দি লাগানো হয়। সরকারের সমালোচনা করার অভিযোগে বেশ কিছু ছাপখানা জব্দ করা হয়। লেখক ও সম্পাদকদের কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়। সরকার গরম পন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। বাংলায় এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিপ্লবীরা গোলাগুলি ও বোমা হামলার পথ বেছে নেয়। এই বোমা হামলার কেসরী সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমর্থনকারী লোকমান্য তিলকের উপর রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ লাগিয়ে তাকে ছয় বৎসরের জন্য ম্যানমারের মন্ডালের কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। বিপিনচন্দ্র পাল কে কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়। লালা লাজপত রাযকে পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত করা হয়।

লাল-বাল-পাল

**মুসলিম লীগের স্থাপনা :** বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসকে জনগনের প্রচন্ড সমর্থন প্রাপ্ত হয়, এই দেখে ব্রিটিশ শাসক অস্থির হয়ে উঠে। ব্রিটিশেরা 'ফুট ডালো রাজ করো' নীতির পুনরায়

একবার অনুসরন করে। ব্রিটিশেরা এই বলা আরম্ভ করলো যে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠন হওয়া প্রয়োজন। ব্রিটিশ সরকার দ্বারা উৎসাহিত করার কারনে মুসলিম সমাজের উচ্চবর্নের একটি প্রতিনিধি দল আগা, খাঁ এর নেতৃত্বে গভর্নর লার্ড, মিন্টোর সার্থে দেখা করে। লার্ড মিন্টো এবং অন্য ব্রিটিশ অধিকারিদের প্রেরনায় ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগের' স্থাপনা হয়।

**মোর্লে-মিন্টো আইন :** ব্রিটিশ সরকারের কামকে কে নিয়ে ভারতীয় জনগনের মধ্যে অসন্তোষের ভাবনা ছিল। জনগনের মধ্যে এই ভাবনা ব্যক্ত ছিল যে ভারতীয় জনগনের দারিদ্রের মুখ্য কারন ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক নীতি। কর্জনের দমন নীতি, সুশিক্ষিত ভারতীয়দের চাকরিতে সমাবিষ্ট না করা, ভারতের বাইরে আফ্রিকায় ভারতীয়দের অপমান এবং অন্যায়পূর্ণ ব্যবহারের কারনে সমাজে অসন্তোষ বেড়ে যায়। ভারতীয়দের এই অসন্তোষের উপর অস্থায়ী স্বরূপে মলম পাটি করার জন্য ১৯০৯সালে মোর্লে-মিন্টো আইন তৈরি করে। এই আইন দ্বারা আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং কিছু নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধির পৌরসভায় (আইন পালিকায়) সম্মিলিত করার নিয়মও তৈরি করা হয়। এই আইন দ্বারাই মুসলিমদের জন্য বিভক্ত (আলাদা) নির্বাচন ক্ষেত্রের পরিকল্পা করা হয়েছে। ব্রিটিশদের এই ধূর্ত নীতির কারনে ভারতে বিভিন্নতাবাদের বীজ বপন করা হয়েছিল।

**লক্ষৌ সমঝোতা (চুক্তি) :** ১৯১৬ সালে লক্ষৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসে উৎপন্ন হওয়া মতপার্থক্য সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়। উক্ত বৎসরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিস লীগের মধ্যে সমঝোতা (চুক্তি) হয়েছে। ইহাকে লক্ষৌ সমঝোতা (চুক্তি) বলা হয়। এই সমঝোতা (চুক্তি) অনুসারে মুসলিমদের বিভক্ত (স্বাধীন) নির্বাচন ক্ষেত্রকে জাতীয় কংগ্রেস স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ভারত কে রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্ত করিয়ে দেওয়ার কাজে মুসলিম লীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সহযোগিতা করবে ইহা তারা স্বীকার করলো।

**হোমরুল আন্দোলন :** ১৯১৪ সালে লোকমান্য তিলক মন্ডালের কারাগার থেকে মুক্ত হয়। এই সময় ইউরোপ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ প্রারম্ভ হয়েছিল। এই যুদ্ধের সীধা পরিনাম ভারত কে ও সহ্য করতে হয়েছিল। প্রয়োজনীয় বস্তুর দাম বেড়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের উপর অনেক প্রতিবন্ধ লাগায়। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ডা.অ্যানি বেজেন্ট এবং লোকমান্য তিলক হোমরুল, আন্দোলন প্রারম্ভ করে। হোমরুল অর্থাৎ নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেরা চালানো ইহাকেই স্বশাসনও বলা হয়। আয়ারল্যান্ডে ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এইরূপ আন্দোলন প্রারম্ভ হয়েছিল। ইহার ভিত্তিতেই ভারতীয় হোমরুল আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্বশাসনের চাহিদা রাখে, ডা.অ্যানি বেজেন্ট এবং লোকমান্য তিলক সম্পূর্ণ দেশে দ্রুত এমন করে জনগনের কাছে স্বশাসনের চাহিদা পৌঁছে দিল। লোকমান্য তিলক দৃঢ়তাপূর্বক বলেছিলেন 'স্বরাজ্য আমারা জন্মগত অধিকার এবং আমি তাহা প্রাপ্ত করবই।'

ডা.অ্যানি বেজেন্ট

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত :** ইউরোপ যুদ্ধ জনিত পরিস্থিতি, ভারতীয় জনগনের মধ্যে বেড়ে চলা অসন্তোষ, হোমরুল আন্দোলনের প্রতিবেড়ে চলা লোকপ্রিয়তা এই পরিস্থিতিতির মধ্যে ভারতীয়দের সহায়োগিতা প্রাপ্ত করা ব্রিটিশদের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এই কারনে সুধারের পরবর্তী কিস্তি ভারতীয়দের দেওয়া মানে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া উচিৎ; ইহা ব্রিটিশ সরকার ভেবেছিল। ভারতকে ধাপে ধাপে স্ব-শাসন এবং দায়িত্বশীল শাসনের অধিকার দেওয়া হবে, ইহা ১৯১৭সালে তৎকালীন ভারতমন্ত্রী মান্টেগু ঘোষনা করে। লোকমান্য তিলক ও ঘোষনা করে যে যদি সরকার ভারতীয়দের দাবির প্রতি সহানুভূতি ও বিবেকপূর্বক বিবেচনা করে তাহলে ভারতীয় জনগনও সরকারকে সহযোগিতা করবে। লোকমান্য তিলকের এই নীতিকে 'প্রতিযোগী সহকারিতা' বলা হয়।

**মান্টেগু-চেমসফোর্ড আইন / কানুন :** ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সংসদ ভারতে সাংবিধানিক সুধার আনার জন্য একটি আইন পাস করে। ইহাকে মান্টেগু-চেমসফোর্ড আইন বলা হয়। এই আইন অনুসারে কম গুরুত্বের খাতাগুলি ভারতীয় মন্ত্রীদের দেওয়া হলো কিন্তু অর্থ, রাজস্ব, গৃহ এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ খাতাগুলি গভর্নরের অধিকারে ছিল। ১৯১৯ সালে আইন অনুসারে ভারতীয়দের দ্বারা যে 'উত্তরদায়ী সরকারের' দাবি করা হয় তাহা পর্যাপ্ত মাত্রায় পূর্ণ করা হয় না। এই আইন সকলকে হতাশ করে। এই আইনের আলোচনা লোকমান্য তিলক এই বলে করেছিলেন যে 'না তো এটা স্বরাজ্য এবং না তো স্বরাজ্যের ভিত্তি।' সকল ভারতীয়রা এই কথা বুঝতে পেরেছিল যে যদি সরকারকে নত করতে হয় তাহলে আন্দোলনকে অত্যাধিক তীব্র করার প্রয়োজন। ভারত একটি নুতন আন্দোলনের জন্য প্রমানিত হয়।

## অনুশীলনী

১. (অ) **প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক বিকল্প বেছে নিয়ে বিবৃতি পুনরায় লেখ।**

(১) ভারত সেবক সমাজের স্থাপনা .......... ইনি করেন।

(অ) গনেশ বাসুদেব জোশী
(ব) ভাই দাজী লাড
(ক) ম.গো.রানডে
(ড) গোপাল কৃষ্ণ গোখলে

(২) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন .......... এখানে আয়োজিত করা হয়।

(অ) পুনে (ব) মুম্বাই
(ক) কোলকাতা (ড) লক্ষ্মৌ

(৩) 'গীতারহস্য' গ্রন্থ .......... ইনি লেখে।

(অ) লোকমান্য তিলক (ব) দাদাভাই নৌরোজী
(ক) লালা লাজপতরায় (ড) বিপিনচন্দ্র পাল

**(ব) নাম লেখো।**

(১) নরম পন্থীর নেতা ............... ...............
(২) গরম পন্থীর নেতা ............... ...............

২. **নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।**

(১) স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয়দের অস্মিতা জেগে ওঠে।
(২) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়।
(৩) লার্ড কর্জন বাংলার বিভাজন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৩. **টিপ্পনী (নোট) লেখো।**

(১) জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য
(২) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন
(৩) জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্সুত্রী

৪. **নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠভূমি (পটভূমি) ব্যাখ্যা করো।**

- প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরন
- আর্থিক শোষন
- পশ্চিমী শিক্ষা
- ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যয়ন
- সংবাদপত্রের কাজ

**উপক্রম**

ইন্টারনেটের সাহায্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রারম্ভিক নেতাদের বিষয় অধিক তথ্য প্রাপ্ত করো।

# ৭. অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কাল 'গান্ধী যুগ' নামে পরিচিত। ১৯২০ সালে লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর পর জাতীয় আন্দোলনের দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীর কাছে আসে। গান্ধীজী সত্য, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করেন ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটি নুতন দিশা প্রদান করেন। গান্ধীজ ীর প্রভাবী নেতৃত্বের কারনে জাতীয় আন্দোলন আরও বেশী ব্যাপক হয়ে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নুতন পর্ব শুরু হয়।

মহাত্মা গান্ধী

**গান্ধীজীর দক্ষিন আফ্রিকায় কাজ :** মহাত্মা গান্ধী ১৮৯৩ সালে ওকালতির কাজে দক্ষিন আফ্রিকা গিয়ে ছিলেন। দক্ষিন আফ্রিকা ইংল্যান্ডের একটি উপনিবেশ ছিল। সেখানে অনেক ভারতীয়রা শিল্প, বানিজ্য ও ব্যবসা করার জন্য স্থায়ীভাবে বসে গিয়েছিল। সেখানকার হিন্দী (ভারতীয়) লোকেদের সঙ্গে অপরাধির ন্যায় ব্যবহার করা হতো। তাদের প্রত্যেক স্থানে অপমান করা হতো। ১৯০৬ সালে সরকার একটি আদেশ জারি করে কৃষ্ণবর্নীয়দের পরিচয় পত্র সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক করে দেয়। তাদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করে সেখানকার লোকদের ন্যায় প্রাপ্ত করিয়ে দেন।

**গান্ধীজীর ভারতে আগমন :** ৯ জানুয়ারী ১৯১৫ সালে গান্ধীজী দক্ষিন আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। নামদার গোপাল কৃষ্ণ গোখলের পরামর্শে তিনি সম্পূর্ন ভারতবর্ষ ভ্রমন করেন। সামান্য জনগনের দু:খ ও দরিদ্রতা দেখে তিনি রাষ্ট্র সেবার শপথ নেন। তিনি সত্যাগ্রহের অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন।

**সত্যাগ্রহের দর্শন :** গান্ধীজী সত্যাগ্রহের নুতন কৌশল জনআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। সত্যাগ্রহের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা রাখা। সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়কারী ব্যক্তিকে সংযম ও অহিংসার পথ অবলম্বন করে সত্য ও ন্যায় উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া এবং সেই ব্যক্তির মন পরিবর্তন করা। সত্যাগ্রহী ব্যক্তি হিংসা অথবা অসত্যের ব্যবহার করা উচিৎ না; এটাই গান্ধীজীর শিক্ষা ছিল।

পরবর্তীকালে শুধু ভারতেই নয় বহু দেশের লোকের অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করে। আমেরিকায় কৃষ্ণবর্নীয়দের অধিকারের জন্য সংঘর্ষকারী মার্টিন লুথর কিং এবং দক্ষিন আফ্রিকায় নেলসন মন্ডেলার উপর গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের প্রভাব পড়েছিল।

**চম্পারন সত্যাগ্রহ :** বিহারের চম্পারন এলাকায় ব্রিটিশ বাগান মালিক ভারতীয় কৃষঙকদের নীলের ফসল ফলাতে বাধ্য করতো। এই নীল নির্ধারিত মূল্যেই বাগান মালিক কে বিক্রয় করার জন্য বাধ্য করা হতো। এই কারনে কৃষকদের আর্থিক হানি সহ্য করতে হতো। গান্ধীজী ১৯১৭ সালে চম্পারন যায়। গান্ধীজী চম্পারনের কৃষকদের সংঘটিত করে সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করে আন্দোলন করেন। গান্ধীজীর ভারতে করা এই প্রথম আন্দোলন সফল হয়, কৃষকদের ন্যায় প্রাপ্ত হয়।

**খেড়া সত্যাগ্রহ :** গুজরাটের খেড়া জেলায় ক্রমাগত অকালের কারনে ফসলের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাসত্ত্বেও সরকারের দ্বারা বাধ্যতামূলক খাজনা আদায় করা হচ্ছিল। গান্ধীজী কৃষকদের খাজনা পরিশোধ না করার পরামর্শ দেন। তখন স্থানীয় কৃষকেরা ১৯১৮ সালে খেড়া জেলায় খাজনা-বন্দির আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজী আন্দোলনের নেতৃত্ব স্বীকার করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার খাজনা মাফ করে।

**অহমদাবাদের শ্রমিক আন্দোলন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মূল্যস্ফীতি প্রচন্ড মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। মিলের শ্রমিকেরা বেতন বৃদ্ধির দাবি করে কিন্তু মিল মালিক তাদের দাবি অমান্য করে দেয়। গান্ধীজীর পরামর্শে শ্রমিকেরা হড়তাল ও অনশন করে। গান্ধীজীও শ্রমিকদের সঙ্গে অনশনে বসে। শেষ পর্যন্ত মিল মালিকেরা পিছে হাটে ও শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে দেয়।

**রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়রা ব্রিটিশদের সহযোগিতা করে। যুদ্ধ সমাপ্তীর পর ভারতীয়দের হিতার্থে নির্ণয় নেওয়া হবে, উত্তরদায়ী সরকার আনা হবে, এই ভারতীয়রা ভেবেছিল। বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি, খাজনা বৃদ্ধি ইত্যাদি আর্থিক ও রাজনৈতিক কারনে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়েই চলছিল।

ব্রিটিশ সরকার এই অসন্তোষ দমন করার জন্য এবং ওই বিষয় সমাধানের পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরসিডনী রৌলট নামের অধিকারীর অধ্যক্ষতায় একটি সমিতি নিযুক্ত করে। এই সমিতীর সুপারিশ অনুযায়ী ১৭ মার্চ ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় বিধান মন্ডলে ভারতীয় সদস্য দ্বারা যে বিরোধ করা হয় তাহা না মেনে নুতন আইন তৈরি করা হয়। তাহাকে 'রৌলট আইন' বলা হয়। এই আইন অনুসারে যে কোন ভারতীয়কে বিনা তদন্তে বন্দি করে আদালতে মামলা দায়র না করে কারাগারে বন্দি করে রাখার অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয়রা এই আইন কে 'কালা আইন' বলে সম্বোধন করে। এই আইনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ দেশজুড়ে ক্ষোভের ঝড় উঠেছিল। গান্ধীজী এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের ঘোষনা করেন। ৬ এপ্রিল ১৯১৯ সালে রৌলট আইনের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করার জন্য দেশব্যাপী হড়তাল করতে আহ্বান করা হয়েছিল। এই আহ্বানে ভারতীয়রা প্রচুর পরিমানে প্রতিসাদ দিয়েছিল।

**জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড :** রৌলট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঘোষনা করা হয়েছিল। এই আন্দোলন পাঞ্জাব প্রান্তে প্রবল রূপ ধারন করেছিল। অমৃতসর শহর এই আন্দোলনের মুখ্য কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। সরকার দমন নীতি শুরু করে। গান্ধীজীকে পাঞ্জাব প্রান্তে প্রবেশ করতে নিষিদ্ধ করা হয়। জনরল ডায়র অমৃতসরে জমায়েদ নিষিদ্ধ আদেশ জারি করে। অমৃতসরে হড়তাল করার অভিযোগে ডা.সত্যাপাল এবং সৈফুদ্দীন কিচলুর মতো বিশিষ্ট নেতাদের বন্দী করা হয়েছিল।

এই ঘটনার নিষেধ করার জন্য ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে বৈশাখী উৎসব উপলক্ষ্যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সময় জনরল ডায়র সেনার গাড়ী নিয়ে সেখানে আসে। জালিয়ানওয়ালাবাগ মাঠের থেকে বাইরে যাওয়ার একটি মাত্র সরু রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা অবরুদ্ধ করে নিরস্ত্র, নিরীহ লোকদের উপর কোনো প্রকারের পূর্ব সূচনা না দিয়ে গুলি চালানো হয়। ১৬০০ রাউন্ড গুলি চালানোর পর গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাওয়ার কারনে গুলি চালানো বন্দ হয়। এই হত্যাকান্ডে প্রায় চার শত নারীপুরুষ মারা যায়। অসংখ্য মানুষ আহত হয়। গুলি চালানোর পরপরই নিষেধাজ্ঞা লাগানোর কারনে আহতদের তাৎক্ষনিক চিকিৎসা করা সম্ভব হয়নি। সম্পূর্ণ পাঞ্জাবে সৈন্য আইন জারি করে সরকার অনেক লোকদের জেলে বন্দ করে। এই হত্যাকান্ডের জন্য-পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ওডবায়র দায়ী ছিল। দেশজুড়ে এই আইনের নিষেধ করা হয়েছিল। হত্যাকান্ডের নিষেধার্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকার দ্বারা দেওয়া 'সর' উপাধি পরিত্যাগ করেন। পরবর্তীতে ভারতীয়রা এই হত্যাকান্ডের তদন্ত করার দাবি করেন। এই কারনে সরকার হন্টর কমিশন নিযুক্ত করে।

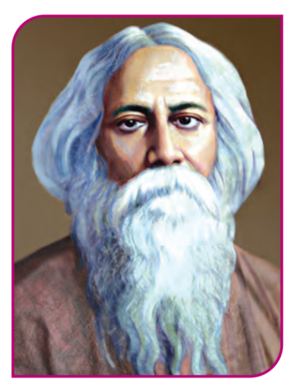
রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর

**খিলাফত আন্দোলন :** তুর্কিস্থানের সুলতান বিশ্বের মুসলমানদের খলিফা অর্থাৎ ধর্মীয় নেতা ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কিস্থান ইংল্যান্ডের বিরোধী পক্ষে ছিল। যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধশেষ হওয়ার পর খলিফাদের সাম্রাজে কোনো ক্ষতি করা হবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষ হওয়ার পর ইংল্যান্ড নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। যে কারনে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। খলিফাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য ভারতীয় মুসলমানেরা যে আন্দোলন শুরু করেছিল, এই আন্দোলনকে 'খিলাফত আন্দোলন' বলা হয়। গান্ধীজী ভেবেছিলেন যে এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে যদি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় আন্দোলন শুরু করা হয়, তাহলে সরকার অবশ্যই সঠিক পথে আসবে। এই কারনে গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের সমর্থন করেন। গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার প্রস্তাব খিলাফত কমিটি মান্য করে। এই সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে।

**অসহযোগ আন্দোলন :** অসহযোগ আন্দোলনের পিছে গান্ধীজীর এই ভাবনা ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। যদি ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের সহিত সম্পূর্ণ রূপে অসহযোগিতা করে তাহলে ব্রিটিশ শাসনের পতন ঘটবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে গান্ধীজী জনগনকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান দিতে আহ্বান করেন।

১৯২০ সালে নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতি দেয়। অসহযোগ আন্দোলনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গান্ধীজীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

**অসহযোগ আন্দোলনের যাত্রা :** অসহযোগ আন্দোলনের যোজনা অনুসারে পন্ডিত মোতীলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস ইত্যাদি বিখ্যাত উকিলেরা আদালতের বহিস্কার করেন। এই সময় বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বহিস্কার করে জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন সফল করার প্রচেষ্টা করা হয়। অনেক জাতীয় বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা হয়। আগত নির্বাচনেরও বহিস্কার করা হয়। বিদেশী বস্ত্রের বহিস্কার করা হয়। বিদেশী বস্ত্র জ্বালানো হয়। বিদেশ বস্ত্র বিক্রয় করা দোকানের সামনে ধর্না দেওয়া হয়। ফলে বিদেশী বস্ত্রের আমদানি কম হয়ে যায়।

'প্রিন্স আফ বেল্স' যিনি ১৯২১ সালে মুম্বাই আসেন তার স্বাগত হড়তালের মাধ্যমে করা হয়। নির্জন রাস্তা এবং বন্দ দোকান রাজপুত্রদের স্বাগত করে। এই আন্দোলন আসামের চা বাগান থেকে বাংলার রেল কর্মী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে সরকার দমননীতি শুরু করে।

১৯২২ খ্রী. ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় প্রদর্শনকারীরা শান্তিপূর্নভাবে জুলুস বের করেছিল। পুলিশেরা এই জুলুসে গুলি চালায়। ফলে ক্ষিপ্ত জনগন (ভিড়) পুলিশ থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ইহাতে একটি পুলিশ অধিকারী সহিত ২২ জন পুলিশকর্মী মারা যায়। এই ঘটনায় গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হন। গান্ধীজী ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করেন।

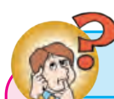

**তুমি জানো কি ?**

**মুলশী সত্যাগ্রহ :** অসহযোগ আন্দোলনের কালে (সময়) পুনে জেলার মুলশী তহশিলে কৃষকেরা সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে। এই সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব সেনাপতী পান্ডুরঙ্গ মহাদেব বাপট করে। এই কারনে তাকে সাত বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

মার্চ ১৯২২ সালে গান্ধীজীকে বন্দী করা হয়। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় তিনটি দেশবিরোধী রচনা লেখার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ চালানো হয়। অহমদাবাদে একটি বিশেষ আদালত স্থাপন করা হয়। গান্ধীজীকে ছয় বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অভিযোগের কারনে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের সাথে-সাথে সৃজনশীল কার্যক্রম ও চালায়। ইহাতে প্রধানত স্বদেশী প্রচার, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, মদ্যপান নিষিদ্ধ, অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত, খাদির প্রচার, জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদির সমাবেশ ছিল। এই সৃজনশীল কার্যক্রমের ফলে জাতীয় আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে আরও ব্যাপক আকার ধারন করে।

**স্বরাজ্য পক্ষ :** জাতীয় কংগ্রেসের চিত্তরঞ্জন দাস, মোতীলাল নেহেরু সরকারকে ঘেরাও করার জন্য বিধান মন্ডল প্রবেশ পাওয়ার পরিকল্পনা করেন। ১৯২২ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধীনে স্বরাজ্য পক্ষের স্থাপনা করে।

১৯২৩ সে হওয়া নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে স্বরাজ্য পক্ষের অনেক প্রত্যাশী নির্বাচিত হয়ে আসে। এর মধ্যে প্রধানত মোতীলাল নেহেরু, মদনমোহন মালবীয়, লালা লাজপতরায়, ন.চিং কেলকরের সমাবেশ ছিল। যখন দেশে রাজ নৈতিক আন্দোলন ঠান্ডা পড়ে গিয়েছিল তখন স্বরাজ্য পক্ষ বিধান পরিষদে সরকারের অন্যায়কারী নীতির তীব্র বিরোধ করেছিল। ভারতে আগত সময় একটি দায়িত্বপূর্ণ সরকার পদ্ধতি দেওয়ার দাবি করেন। ভারতীয়দের সমস্য সমাধানের জন্য গোলমেজ পরিষদের আয়োজন করা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি করা, এর জন্য বিধান পরিষদে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিল। সরকার স্বরাজ্য পক্ষের অধিকাংশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

**সাইমন কমিশন :** ১৯১৯ সালে মান্টেগু চেমসফোর্ড আইন দ্বারা যে সুধার করা হয় তাহা অসন্তোষজনক ছিল। এই কারনে ভারতীয় জনগনের মধ্যে অসন্তোষ ব্যাপ্ত ছিল। এই পার্শ্বভূমিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালে সর জাঁন সাইমনের অধ্যক্ষতায় একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনে মোট সাত জন সদস্য ছিল কিন্তু এই সদস্যদের মধ্যে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না। এই কারনে ভারতের রাজনৈতিক দল সাইমন কমিশনের বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সাইমন ফিরে যাও।

১৯২৪ সালে সাইমন কমিশন ভারতে আসে। এই কমিশন যেখানে -যেখানে গিয়েছে; সেখানে-সেখানে তাদের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করা হয়েছে। 'সাইমন গো ব্যাক' 'সাইমন ফিরে যাও' এই ঘোষবাক্য দ্বারা তীব্র প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। প্রদর্শনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। লাহোরে লালা লাজপতরায়ের নেতৃত্বে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করা হয়েছিল। প্রতিবাদী পুলিশ অধিকারী স্যান্ডর্স লাঠি দ্বারা লালাজীর বুকের উপর আঘাত করে।

লালা লাজপতরায়

এই হামলার পর নিন্দা-ভৎসর্না সভায় লালাজী বলেছিলেন, " লাঠির প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কফিনে এক-একটি করে পেরেক (খিলা) মারা হচ্ছে।" পরবর্তীতে কিছুদিন পরেই লালাজী মারা যান।

**নেহেরু প্রতিবেদন :** ভারতের সকল নেতারা মিলে একমতে সংবিধান প্রনয়ন করতে পারবে না, এই ধরনের সমালোচনা ভারতমন্ত্রী বর্কন হেড করে। এই আহ্বান কে স্বীকার করে সর্বদলীয় সমিতি (কমিটি) গঠন করা হয়। এই সমিতির (কমিটির) অধ্যক্ষ পন্ডিত মোতীলাল নেহেরু ছিলেন।

ভারতে স্বাধীন উপনিবেশিক সরকার গঠন করা,

বয়স্ক মতদান পদ্ধতি প্রারম্ভ করা, ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান করা, ভাষা ভিত্তিতে প্রান্ত রচনা করা এইরূপ প্রস্তাব এই প্রতিবেদনে ছিল। এই প্রতিবেদন কে নেহেরু প্রতিবেদন বলা হয়।

১৯২৯ সের শেষ পর্যন্ত সরকার যদি নেহেরু প্রতিবেদন স্বীকার না করে তাহলে সবিনয় অবজ্ঞা আন্দোলন প্রারম্ভ করার আভাস জানানো হয়। এই পার্শ্বভূমিতে ১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে পন্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর অধ্যক্ষতায় লাহোরে একটি অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশন ঐতিহাসিক প্রমাণিত হয়।

**পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি :** স্বাধীন উপনিবেশদের সরকার ইহা এই পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল যা অনেক যুব নেতাদের মান্য ছিল না। পন্ডিত জবাহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বোস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করা যুবকদের নেতা ছিল। এই যুব দলের প্রভাবের ফলে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করা হয়। এই প্রস্তাব দ্বারা জাতীয় সভা স্বাধীন উপনিবেশের সরকারের উদ্দেশ্য ত্যাগ করে। এর পর ভারতের পূণ স্বাধীনতা জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হয়ে উঠে।

পন্ডিত জবাহরলাল নেহেরু

৩১ ডিসেম্বর ১৯২৯ সে রাবী নদীর তীরে পন্ডিত জবাহরলাল নেহরু তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেন এবং ২৬ জানুয়ারী এই দিন স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করবার জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ (লড়াই) অহিংসার পথে চালাবার অঙ্গীকার সম্পূর্ণ দেশে ২৬ জানুয়ারী ১৯৩০ সালে নেওয়া হয়। ফলে সম্পূর্ণ দেশে একটা চেতনার বাতাবরন উৎপন্ন হয়।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(১) গান্ধীজী নিজের কাজের প্রারম্ভ ......... থেকে করে।
(অ) ভারত (ব) ইংল্যান্ড
(ক) দক্ষিণ আফ্রিকা (ড) ম্যানমার

(২) কৃষকেরা ......... জেলায় খাজনা বন্দীর আন্দোলন প্রারম্ভ করে।
(অ) গোরখপুর (ব) খেড়া
(ক) সোলাপুর (ড) অমরাবতী

(৩) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের নিষেধার্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকার দ্বারা দেওয়া ......... উপাধি পরিত্যাগ করেন।
(অ) লার্ড (ব) সর
(ক) রাওবহাদুর (ড) রাওসাহেব

**২. নিম্ন প্রশ্নের উত্তর এক-এক বাক্যে লেখো।**

(১) দক্ষিন আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্নীদের উপর ১৯০৬ খ্রী.আদেশ অনুসারে কি প্রতিবন্ধ লাগানো হয়?
(২) গান্ধীজী ভারতে প্রথম সত্যাগ্রহ কোথায় করেন?
(৩) জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালানোর আদেশ কোন অধিকারী দিয়েছিল?

**৩. নিম্ন প্রশ্নের উত্তর ২৫ থেকে ৩০ শব্দ লেখো।**

(১) সত্যাগ্রহের দর্শন ব্যাখ্যা করো।
(২) স্বরাজ্য পক্ষের স্থাপনা কেন করা হয়েছে?

**৪. নিম্নলিখিত কথনগুলি কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।**

(১) ভারতীয় জনগন রৌলট আইনের বিরোধ করে।
(২) গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করেন।
(৩) ভারতীয়রা সাইমন কমিশনের বহিস্কার করে।
(৪) ভারতে খিলাফত আন্দোলন চালানো হয়।

**উপক্রম**

২৬ জানুয়ারী ১৯৩০ সালে স্বাধীনতার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। সেই অঙ্গীকার প্রাপ্ত করো এবং শ্রেনীকক্ষে তার বাচন করো।

# ৮. সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলন

লাহোর অধিবেশনের সম্পূর্ণ স্বাধিনতার প্রস্তাব পারিত হলে মহাত্মা গান্ধী সবিনয় আইন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই আন্দোলন শুরু করার আগে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি জানিয়েছিলেন। মূল দাবি ছিল লবনের উপর লাগানো কর বন্ধ করে লবন উৎপাদনে সরকারের একাধিকার ও অধিপত্য বন্ধ করা। কিন্তু সরকার গান্ধীজীর দাবি প্রত্যাখ্যান করার পর, গান্ধীজী লবন আইন ভঙ্গ করার এবং সম্পর্ণ দেশে সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেন।

দান্ডি আন্দোলন যাত্রা

সাধারন মানুষের খাদ্যে লবন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটক। লবনের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা এটি অন্যায়কারি ছিল। লবন সত্যাগ্রহ প্রতিকাত্মক ছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারী ও অন্যায়কারী আইন ভঙ্গ করা।

লবন সত্যাগ্রহের জন্য গান্ধীজী গুজরাটের উপকূলে দান্ডি নামের জায়গাটি বেছে নিয়েছিল। ১২ মার্চ ১৯৩০ সালে গান্ধীজী ১৮ গন সঙ্গীসহ সাবরমতী আশ্রম থেকে দান্ডির উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি প্রায় ৩৮৫ কিলোমিটার চলার পথে গ্রামে-গ্রামে ভাষন দিয়েছেন। গান্ধীজী তার ভাষনে জনগণকে নির্ভীক হয়ে আইনভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের আবেদন করেছিলেন। গান্ধীজীর এই ভাষনের কারনে আইনভঙ্গ আন্দোলনের বার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই আন্দোলনের জন্য অনুকূল পরিবেশ নির্মাণ তৈরি হয়। ৫ এপ্রিল ১৯৩০ সালে গান্ধীজি দান্ডি এখানে পৌছালেন। ৬ এপ্রিল এই দিনে গান্ধীজী দান্ডির সমুদ্র উপকূল থেকে লবন তুলে লবন আইন ভঙ্গ করেন এবং দেশজুড়ে সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়।

**পেশোয়ারের সত্যাগ্রহ :** উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফারখান গান্ধীজীর নিষ্ঠাবান অনুগামী ছিলেন। তিনি 'সরহদ্দ গান্ধী' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি 'খুদা-ই-খিদমতগার' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালের ২৩ শে এপ্রিল তিনি পেশোয়ারের সত্যাগ্রহ শুরু করেন। প্রায় এক সপ্তাহ পেশোয়ার শহরটি সত্যাগ্রহীদের নিয়ন্ত্রনে ছিল। সরকার গড়ওয়াল পলটনকে সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু গড়ওয়াল ব্যাটালিয়ান অফিআর চন্দ্রসিংহ ঠাকুর গুলি চালাতে অস্বিকার করেন, তাই সৈনিকী আদালতে তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে।

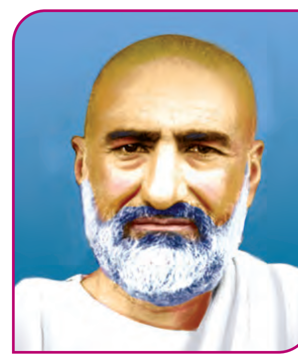

খান আবদুল গফারখান

মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা শুরু হওয়া আইনভঙ্গ আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে সমস্যায় ফেলে দেয়। ১৯৩০ সালের ৪ মে এই দিনে গান্ধীজীকে গ্রেফতার করা হয়। দেশজুড়ে দমন-পীড়নের নিতি শুরু করা হয়। গান্ধীজীর গ্রেফতারে দেশজুড়ে নিষেধ করা হয়েছিলো।

**সোলাপুর সত্যাগ্রহ :** সোলাপুরের সত্যাগ্রহে মিল শ্রমিকরা সত্যাগ্রহের অগ্রভাগে ছিলেন। ৬ মে ১৯৩০ সালে সোলাপুরে হড়তাল পালন করা হয়েছিল এই উপলক্ষে সোলাপুরে একটি বিশাল মিছিল বের করা হয়। তৎকালীন কালেক্টার মিছিলে গুলি চালানোর আদেশ দেন। এতে শঙ্কর শিবদার

সহ বহু স্বেচ্ছাসেবক নিহত হন। ফলে মানুষ পুলিশ স্টেশন, রেল স্টেসন / আদালত, পৌরসভা ভবন ইত্যাদিতে হামলা করে। সরকার মার্শল ল অর্থাৎ সৈনিকী আইন জারি করে। আন্দোলনকে দমন করা হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মালাপ্পা ধনশেট্টি, শ্রীকৃষ্ণ সারডা, কুরবান হুসেন এবং জগন্নাথ শিন্দেকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

**ধরাসনা সত্যাগ্রহ :** গুজরাটে ধরাসনা এখানকার

মালাপ্পা ধনশেট্টি

শ্রীকৃষ্ণ সারডা

কুরবান হুসেন

জগন্নাথ শিন্দে

সত্যগ্রহের নেতৃত্ব সরোজিনী নাইডু করেছিলেন। লবন আইন ভাঙতে বের হওয়া সত্যাগ্রহীরা পুলিশের হাতে মার খেয়েছে। সত্যাগ্রহীরাও নীরবে লাঠির প্রহার সহ্য করছিলেন। তাদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার পর আরেকটি দল

সরোজিনী নাইডু

সত্যাগ্রহের জন্য এগিয়ে আসত। এটি নিরন্তরভাবে চলতে থাকে। মহারাষ্ট্রের বডালা, মালবন, শিরোডা এই স্থানে লবন সত্যাগ্রহ হয়েছিল। যেখানে লবনাক্ত ভাগ ছিল না সেখানে লোকেরা জঙ্গল আইন ভাঙতে শুরু করেন। মহারাষ্ট্রে বিলাশি, সংগমনের, কলবন, চিরনের, পুসদ ইত্যাদি জায়গায় জঙ্গল সত্যাগ্রহ হয়েছিলো। আদিবাসীরা বিপুল সংখ্যক সত্যাগ্রহে অংশগ্রহন করেছিল।

**বাবু গেনুর বলিদান :** মুম্বাইতে বিদেশী পন্যের উপর বহিষ্কার আন্দোলন শুরু ছিল। আন্দোলনকারীরা বিদেশি পন্যবাহী যানবাহনগুলি থামিয়ে দেয়। মুম্বাইয়ের একটি মিলে কাজ করতেন বাবু গেনু সৈয়দ, তিনি এই আন্দোলনে অগ্রসর ছিলেন।

পুলিশের হেফাজতে একটি বিদেশি পন্যবাহী ট্রাক বাবু গেণুর সামনে আসে। তারা ট্রাক থামাতে রাস্তায় শুয়ে পড়ে। পুলিশেরা ধমকি দেওয়া সত্ত্বেও সে সরেনি। অবশেষে ট্রাকর্টি তার গায়ের উপর দিয়ে যায়। এই ঘটনায় বাবু গেনু শহীদ হন। বাবু গেনুর এই বলিদান এবং আত্মত্যাগ জাতীয় আন্দোলনকে অনুপ্রানিত করেছিল।

বাবু গেনু

### তুমি জানো কি ?

**আইনভঙ্গ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য :**

- এ পর্যন্ত এই আন্দোলন শহর বিভাগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে জনগন তাদের অংশগ্রহনের কথা জানিয়েছে।
- মহিলারাও এতে অংশগ্রহন করেন। কস্তুরবা গান্ধী, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অবন্তিকাবাই গোখলে, লীলাবতী মুন্সী, হংসাবেন মেহতা, সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করেন।
- এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে অহিংসক পদ্ধতিতে করা হয়েছিল। বৃটিশ শাসন খুব নির্যাতন করা সত্ত্বেও জনগন নিরস্ত্র হয়ে প্রতিরোধ করে। এভাবে ভারতীয় জনগন নির্ভীক হয়ে ওঠে।

**গোলমেজ পরিষদ :** সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলন যখন শুরু ছিল তখন ভারতের সাথে সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিষয়গুলি শুরুতেই বিবেচনা করা উচিৎ, এই মন্তব্য বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ইনি রেখেছিল। এই জন্য তিনি লন্ডনে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনকে গোলমেজ পরিষদ বলে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে তিনটি গোলমেজ পরিষদের আয়োজন করা হয়েছিল।

**প্রথম গোলমেজ পরিষদ :** র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রথম গোলমেজ পরিষদের সভাপতি ছিলেন এই সম্মেলনে ভারত এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এতে ডা.বাবাসাহেব আম্বেডকর, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ব্যারিস্টার জিনা ইত্যাদি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্তরে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, ভারতে কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের স্থাপনার মতো বিভিন্ন বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন জাতীয় দল ও রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তাতে অংশগ্রহন করেননি। জাতীয় কংগ্রেস ছিল দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা, তার সহভাগ ছাড়া গোলমেজ পরিষদের আলোচনা নিষ্ফল হয়েছিল।

**গান্ধী ইরবিন চুক্তি :** গোলমেজ পরিষদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় জাতীয় কংগ্রেস যোগ দেবে এমন আশা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্যক্ত করে। প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের বিবেচনা করে ভাইসরায় গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতাদের কারাগার থেকে মুক্ত করে। জাতীয় কংগ্রেস যাতে মুক্তভাবে আলোচনা করতে পারে তারজন্য একটি অনুকুল পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী এবং ভাইসরায় ইরবিনের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। একে গান্ধী ইরবিন চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তির অধীনে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রস্তাবিত সংবিধানে একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহনের নিশ্চয়তা দেয়। ফলস্বরূপ জাতীয় কংগ্রেস সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলন স্থগিত করে এবং দ্বিতীয় গোলমেজ পরিষদে অংশগ্রহনের জন্য প্রস্তুতি ব্যক্ত করে।

**দ্বিতীয় গোলমেজ পরিষদ :** ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলমেজ পরিষদের বৈঠক আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সাথে-সাথে ভারতের বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, দল এবং উপনিবেশবাদীদের প্রতিনিধিকে ও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। গোলমেজ পরিষদে সরকার সংখ্যালঘুদের বিষয়টি উপস্থিত করে। এই বিষয়টি নিয়ে এবং ভবিষ্যতের কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের সংবিধানের স্বারূপকে নিয়ে মতভেদ নির্মাণ হয়। গান্ধীজী সবার মধ্যে একমত নির্মানের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে হতাশ হয়ে গান্ধীজী ভারতে ফিরে আসেন।

**পুনে চুক্তি :** ডা.বাবাসাহেব আম্বেডকর গোলমেজ পরিষদে দলিতদের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি দলিতদের জন্য আলাদা নির্বাচন এলাকা দাবি করেন। দ্বিতীয় গোলমেজ পরিষদের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড জাতিগত নির্বাচন এলাকা ঘোষনা করেন। সেই অনুযায়ী দলিতদের জন্য স্বাধীন নির্বাচনী এলাকা ঘোষনা করা হয়। তদনুসারে হিন্দু সমাজের বিভাজন নিশ্চিত ছিল তাই এই ধরনের বিভাজন গান্ধীজীর কাছে গ্রহনযোগ্য ছিলো না। তাই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এরবড়া জেলে আমরন অনশন শুরু করে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ডা.বাবাসাহেব আম্বেডকরকে তার দাবি পুনর্বিবেচনার (আহ্বান) প্রার্থনা করে। রাষ্ট্রহিতের কথা চিন্তা করে ডা.বাবাসাহেব আম্বেডকর এই অনুরোধটি স্বীকার করলেন। ১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী এবং ডা.বাবাসাহেব আম্বেডকরের মধ্যে পুনে এখানে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিটি 'পুনে চুক্তি' নামে পরিচিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী দলিতদের জন্য আলাদা নির্বাচনী এলাকার জায়গায় সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার বিধান করা হয়েছিল।

ডা.বাবাসাহেব আম্বেডকর

**তৃতীয় গোলমেজ পরিষদ :** ১৯৩২ সালে নভেম্বর মাসে ইংল্যান্ডে তৃতীয় গোলমেজ পরিষদের আয়োজন করা হয়। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস এই সম্মেলনকে বহিস্কার করে। তাই এই সম্মেলন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

**সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলনের দ্বিতীয় রাউন্ড:** দ্বিতীয় গোলমেজ পরিষদ থেকে উদ্বিগ্ন মন নিয়ে গান্ধীজী ভারতে ফিরে আসেন। তিনি আবার সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলন করবার সিদ্ধান্ত করেন। সরকার গান্ধীজীকে অবিলম্বে বন্দী করে নেয়। এই কারনে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

সরকার এই আন্দোলনকে অমানবিক দমন-পীড়ন দিয়ে তার উত্তর দিয়েছে। সর্বত্র নাগরিক অধিকারের শ্বাসরোধ করা হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলিকে অবৈধ বেআইনি ঘোষনা করা হয়। তাদের অফিস এবং ধকাগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে গিয়েছিল। জাতীয় সংবাদপত্র এবং সাহিত্যের উপর নির্বন্ধ লাগানো হয়েছিল। অবশেষে, ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী আন্দোলন স্থগিত করে এবং সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলনের ঐতিহাসিক সময়ের সমাপ্তি ঘটে।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(মহাত্মা গান্ধী, খুদা-ই-খিদমতগার, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, সরোজিনী নাইডু)

(১) লন্ডনে ............ দ্বারা গোলমেজ পরিষদের আয়োজন করা হয়েছিলো।

(২) খান আব্দুল গফার খান ............ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩) ধারাসনা সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব ........ করেছিলেন।

(৪) দ্বিতীয় গোলমেজ পরিষদে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে ............ উপস্থিত ছিল।

**২. নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।**

(১) চন্দ্রসিংহ ঠাকুরকে সৈনিক আদালতে কঠোর শাস্তি দেয়।

(২) সোলাপুরে সরকার মার্শল ল অর্থাৎ সৈনিকী আইন জারি করে।

(৩) প্রথম গোলমেজ পরিষদের আলোচনা নিস্ফল হয়েছিল।

(৪) গান্ধীজী এরবড়া জেলে আমরন অনশন শুরু করে।

**৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নের ২৫ থেকে ৩০ শব্দে উত্তর লেখো।**

(১) গান্ধীজী লবনের আইন ভঙ্গ করে সারা দেশে সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত কেনো নিয়েছিলেন?

(২) জাতীয় কংগ্রেস সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলনকে স্থগিত কেনো করে?

**৪. সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলনের নিম্ন কালরেখা পূর্ণ করো।**

| ১২ মার্চ ১৯৩০ | ৬ এপ্রিল ১৯৩০ | ২৩ এপ্রিল ১৯৩০ | ৪ মে ১৯৩০ | ৬ মে ১৯৩০ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**উপক্রম**

(১) সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলনে নিম্ন ব্যক্তির কার্যকলাপ সম্পর্কে আরও তথ্য প্রাপ্ত করে ফটো সহ শ্রেনীতে প্রদর্শন করো।

(অ) সরোজিনী নাইডু

(ব) খান আব্দুল গফার খান

(ক) বাবু গেনু সৈয়দ

(২) পাঠে উল্লেখ করা সবিনয় আইনভঙ্গ আন্দোলনের স্থান ভারতের মানচিত্র রূপরেখায় দেখাও।

# ৯. স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্ব

এই পাঠে আমরা ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ভূমিগত আন্দোলন, আজাদ হিন্দ সেনার কাজ ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করবো।

**১৯৩৫ সালের আইন :** এই আইন অনুসারে ভারতে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ এবং রিয়াসতকে এক করে ভারতে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংঘ রাজ্য) প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়েছিল। এই অনুসারে ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসন ভারতীয় প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করার কথা ছিলো। যদি রিয়াসতগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যোগ দেয় তবে কোনো স্বায়ং ও শাসন থাকবে না, তাই রিয়াসতগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। তাই এই আইনে কেন্দ্রশাষিত অঞ্চলের পরিকল্পনা সরাসরী আসতে পারেনি।

**প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা :** ১৯৩৫ সালের আইন দ্বারা যদিও জাতীয় কংগ্রেস সন্তুষ্ট ছিল না, তাহলেও এই আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস অংশগ্রহনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩৭ সালে এগারোটি রাজ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। তার মধ্যে আট রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেস তার মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সত্যায় আসে। তার মধ্যে তিনটি প্রদেশে কোনো দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সেখানে গঠবন্ধন সরকার গঠিত হয়।

জাতীয় কংগ্রেসের মন্ত্রিমন্ডলেরা রাজনেতাদের কারাগার থেকে মুক্তি, উদ্যোগী শিক্ষা শুরু করা, কৃষকদের জন্য ঋন নিবারন আইন এমন অনেক লোককল্যানকারি কাজ তারা করেছেন।

**ক্রিপস পরিকল্পনা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যাড জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার পক্ষ নিয়েছিলেন। জাপানি সৈন্য বাহিনী ভারতের পূর্ব সীমান্তের কাছাকাছি চলে আসে। যদি জাপান ভারতের উপর আক্রমন করে তাহলে তার প্রতিকার করার জন্য ভারতীয়দের সহযোগ প্রাপ্ত করা এটা ইংল্যান্ড প্রয়োজন অনুভব করেছিল। তাই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বিন্সটন চর্চিল ইনি স্টাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে তিনি ভারতের বিষয়ে একটি পরিকল্পনা ভারতীয়দের সম্মুখে উপস্থাপন করে, কিন্তু এই পরিকল্পনায় কোনো রাজনৈতিক দল সন্তুষ্ট হয়নি। এই পরিকল্পনায় স্পষ্টভাবে সম্পুর্ণ স্বাধীনতার উল্লেখ ছিলো না। তাই জাতীয় কংগ্রেস এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। ক্রিপস পরিকল্পনায় পাকিস্তান সৃষ্টির (নির্মীতির) উল্লেখ না থাকায় মুসলিম লীগও এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে।

**দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং জাতীয় সভা :** ১৯৩৯ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তৎকালীন ভাইসরায় লার্ড লিংলিথগো ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত ইংল্যান্ডের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। ইংল্যান্ড দাবি করে যে তারা ইউরোপে গনতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে। তখন জাতীয় কংগ্রেস দাবি করে যে ইংল্যান্ডের এই দাবি যদি সত্য হয় তাহলে ইংল্যান্ড ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদান করুক। এই দাবি মেনে নিতে ইংল্যান্ড অস্বীকার করার ফলে ১৯৩৯ সালের নভেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

**ভারত ছাড়ো আন্দোলন :** ক্রিপস পরিকল্পনার পর জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য প্রখর আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৪ জুলাই ১৯৪২ সালে ওয়ার্ধা এখানে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহীরা ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান শীঘ্র সমাপ্ত করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করে। এই দাবি পূরণ না হলে জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য অহিংসক আন্দোলন শুর করবে, সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছিল।

**ভারত ছাড়ো প্রস্তাব :** ১৭ আগস্ট ১৯৪২ সালে মুম্বাইয়ের গবালিয়া ট্যাঙ্ক গ্রাউন্ডে (ক্রান্তি ময়দান) জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয় এই সম্মেলনের সভাপতি মৌলানা অবুল কলাম আজাদ ইনি ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহীরা ওয়ার্ধায় ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাও

মৌলানা আজাদ

এই প্রস্তাব পাস করেছিল, মুম্বাই অধিবেশনে এই প্রস্তাবে অন্তিম মোহোর লাগার কথা ছিলো।

৮ ই আগস্ট পন্ডিত জবাহারলাল নেহেরু 'ভারত ছাড়ো' এই প্রস্তাব রাখে এবং এই প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে পাশ হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী অহিংসক আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত ও নেওয়া হয়। গান্ধীজী বলেছিলেন "এই মুহূর্ত থেকে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের এটা বুঝতে হবে আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি এবং আমাদের অবশ্যই একটি স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে আচরণ করতে হবে--- আমরা হয় ভারতকে স্বাধীন করব অথবা তা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করব।" গান্ধীজী "করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে" স্ফূর্তিদায়ক চেতনা নিয়ে জনগনের কাছে ত্যাগ প্রমানের আবেদন করেছিলেন।

**জন আন্দোলন আরম্ভ :** জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের গ্রেফতারের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতা স্থানে-স্থানে মিছিল বের করে। পুলিশ জনগনের উপর লাঠিচার্জ করে, গুলি চালায়, তবুও মানুষ ভয়ভীত হয়নি। ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির প্রতীক হয়ে ওঠা কারাগার, পুলিশ থানা, রেল স্টেশন ইত্যাদি স্থানে আন্দোলনকারীরা হামলা চালায়। সরকারি অফিসগুলি নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। মহারাষ্ট্রে চিমুর, আষ্টী, য়াওলি, মহাড়, গারগোটি ইত্যাদি বহু গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধদের প্রানপনে ও অসাধারণ ধৈর্য নিয়ে লড়াই করা এটা অবিস্মরনীয় ছিলো।

**চলো বুঝে নেবো...**

**ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ :** ব্রিটিশ সরকার ক্রমাগত ভাবে দাবী উপেক্ষা করতে থাকায় জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধ বিরোধী অভিয়ান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর জন্য সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল যে, কোনো প্রকারের সামুহিক আন্দোলন না করে একজন ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করবেন। একে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ বলা হয়। আচার্য বিনোবা ভাবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রথম সত্যাগ্রহী ছিলেন। এরপর প্রায় পঁচিশ হাজার সত্যাগ্রহী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশগ্রহন করেন এবং কারাবাস ভোগ করেন।

আচার্য বিনোবা ভাবে

**তুমি জানো কি ?**

**বালবীরদের অনুপ্রেরনামূলক গল্প...**

স্বাধীনতা আন্দোলনে বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও অবদান রেখেছে। নন্দুরবারে একটি বিদ্যালয়ে শিরীষ কুমারের নেতৃত্বে তিরঙা পতাকা নিয়ে ছাত্ররা মিছিল করেছে। বন্দেমাতারমের নারা লাগায়। পুলিশরাও ক্রোধে ছোট শিশুদের উপর গুলি চালায়। এই গুলি বর্ষনে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিরীষকুমার, লালদাস, ধনসুখলাল, শশীধর এবং ঘনশ্যাম আত্মত্যাগ করে শহীদ হন।

শিরীষ কুমার

জয়প্রকাশ নারায়ণ

**ভূমিগত আন্দোলন :** ১৯৪২ সালের শেষের দিকে জনআন্দোলনে নতুন মোড় আসে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব তরুণ সমাজবাদী কর্মীদের হাতে আসে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডা.রামমনোহর লোহিয়া, ছোটুভাই পুরানিক, অচ্যুতরাও পটবর্ধন, অরুণা অসফ অলি, ইউসুফ মেহর অলি, সুচেতা কৃপালানি, এস.এম.যোশী, শিরুভাই লিমায়ে, না.গ.গোরে, যশবন্তরাও চওহান, বসন্তদাদা পাটিল, মগনলাল বাগড়ী, উষা মেহতার মতো অনেক নেতা এই আন্দোলনে অগ্রসর ছিলো। আন্দোলনকারীরা রেললাইন ভাংচুর করা, টেলিফোনের তার কাটা, ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার মতো কর্মকান্ডের মাধ্যমে যোগাযোগ, সঞ্চার মাধ্যম এবং সরকারী ব্যবস্থাকে বিঘ্নিতকরে বিরক্ত করে তোলে। সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

অরুণা অসফ অলী

অচ্যুতরাও পটবর্ধন

সিন্ধু প্রদেশে হেমু কলানি, খবর পেয়েছিলেন যে সশস্ত্র ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বহনকারী একটি ট্রেন এগিয়ে আসছে, তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে রেলপথটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। আদালত তাদের সবাইকে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেন।

বর্তমান রায়গড় জেলার কর্জত তালুকার ভাই কোতবালের 'আজাদ দস্তা' এবং নাগপুরের জনরল আওয়ারীর 'লালসেনা' এ ধরনের দল কয়েক মাস ধরে সরকারের নাকে দম নেওয়ার সময় দেয়নি। মুম্বাইতে বিঠ্ঠল জবেরী, উষা মেহতা এবং তাদের সহযোগীরা একটি গোপন প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন করে। তাকে ''আজাদ রেডিও'' বলা হতো। এই রেডিওতে রাষ্ট্রভক্তির গান গাওয়া হতো। দেশে আন্দোলনের বর্তমান খবর এবং দেশপ্রেমের উপর বক্তৃতা (ভাষণ) প্রচার করা হতো। এতে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে জনগণকে উৎসাহিত করেছে। এই ধরনের প্রসারণ কেন্দ্র কলকাতা, দিল্লী এবং পুনেতে বেশ কিছুদিন ধরে চলেছে।

**সমানান্তর সরকার :** দেশের কিছু অংশ থেকে ব্রিটিশ অধিকারীদের বিতাড়িত করে সেখানে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। একে সমানান্তর সরকার বলা হয়। বাংলার মেদিনীপুর, উত্তরপ্রদেশের বালিয়া এবং আজমগড়, বিহারের ভাগলপুর এবং পুর্নিয়া জেলায় সমানান্তর সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় ক্রান্তিসিং নানা পাটিল ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকারকে বিলুপ্ত করে একটি সমানান্তর সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। কুন্ডল নামক এলাকায় বিপ্লবী নেতা জি.ডি.উর্ফ বাপু লাডের নেতৃত্বে গঠিত তুফান সেনার মাধ্যমে কর আদায়, আইন শ্রঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া এই ধরনের কাজ সমানান্তর সরকারদ্বারা করা হতো। এই সরকার দ্বারা নিযুক্ত লোকন্যায়ালয়গুলি জনগণের বিরোধ নিষ্পত্তি করত এবং জনগণ তাদের ন্যায়বিচারও গ্রহন করত। এই সরকার মহাজন প্রথার বিরোধ করা, মদ নিষিদ্ধ,সাক্ষরতার প্রসার, জাতিগত বৈষম্য দুর করার মতো সৃজনশীল কাজ করেছেন। তাই সমানান্তর সরকার জনগণের অনুপ্রেরনা স্থান হিসেবে প্রমাণিত হয়।

ক্রান্তিসিং নানা পাটিল

**ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মহত্ব :** ১৯৪২ সালের আন্দোলনটি দেশব্যপী আন্দোলনের রূপ ধারন করে নেয়। স্বাধীনতা অর্জন ছিল ভারতীয়দের লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অসংখ্য ভারতীয় ত্যাগ স্বীকার করে। অনেকে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। আন্দোলনকারীদের সংখ্যা এত বেশি ছিলো যে তাদের বন্দি করে রাখার জন্য দেশের কারাগারও অপর্যাপ্ত ছিলো। সানে গুরুজী, রাষ্ট্রসন্ত তুকড়োজী মহারাজ এনাদের রাষ্ট্রভক্তি গান আন্দোলনকারীদের উৎসাহ বাড়িয়েছিলো। এই দেশব্যাপী আন্দোলনকে ''আগস্ট ক্রান্তীও'' বলা হয়।

রাষ্ট্রসন্ত তুকড়োজী মহারাজ

**আজাদ হিন্দ সেনা :** ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু অভূতপূর্ব চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের পূর্ব সীমান্তে হাজার হাজার ভারতীয় সেনা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রুখে দাঁড়ান। এইসব সৈন্যরা আজাদ হিন্দ সেনার ছিল। তাদের নেতা ছিলো নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেজের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। তিনি দুইবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যস্ত আছে তার সুযোগ নিয়ে ভারতে আন্দোলনকে আরও তীব্র করা উচিৎ। তারজন্য ব্রিটিশদের শত্রু যারা তাদের

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস

সাহায্য নিতে হবে এমনই সুভাষ বাবুর অভিমত ছিলো। কিন্তু এই বিষয়ে জাতিয় কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতাদের সাথে তার মতভেদ হওয়ার ফলে সুভাষবাবু সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন। জনগনের সামনে তার মতামত তুলে ধরতে তিনি একটি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দল গঠন করেন।

সুভাষ চন্দ্র বসু তার ভাষণ থেকে ব্রিটিশ ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ভারতীয়দের কাছে আবেদন করতে লাগলো। সেই কারণে সরকার সুভাষ বাবুকে বন্দীকরে কারারুদ্ধ করেছিল। সুভাষ বাবু জেলে থেকে আমরন অনশন শুরু করার পর সরকার তাকে মুক্তি দেয় এবং তার নিজঘরে তাকে নজরবন্দি করে রাখে। সুভাষবাবু ছদ্মবেশ ধারন করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জার্মানিতে আসেন। সেখানে তিনি ফ্রী ইন্ডিয়া (মুক্ত ভারত) কেন্দ্র স্থাপন করেন। জার্মানের বর্লিন রেডিও স্টেশন থেকে জনগনকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেওয়ার আহবান জানায়। এই সময় রাসবিহারী বোস সুভাষ বাবুকে জাপানে আসার আমন্ত্রণ জানান।

রাসবিহারী বোস

**আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা :** রাশবিহারী বসু ১৯১৫ সালের থেকে জাপানে বসবাস করছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের সংগঠিত করে তিনি 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ সালের প্রথমার্ধে, জাপান দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলি জয় করে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য ও অফিসার জাপানের হাতে ধরা পড়ে। ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের নেতৃত্বে রাস বিহারী বসু যুদ্ধে বন্দী করা ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটি দল তৈরী করে। তাকে 'আজাদ হিন্দ সেনা' নাম দেওয়া হয়। পরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ সেনার নেতৃত্ব করেন।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে নেতাজী সিঙ্গাপুর এখানে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। শহানবাঝ খান, জগন্নাথ ভোসলে, ডা.লক্ষ্মী স্বামীনাথন, গুরুবক্ষ সিং ঢিল্লো, প্রেমকুমার সেহগাল ইত্যাদী তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন ঝাঁসি রানি মহিলা পল্টনের প্রধান ছিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতীয় জনগনকে বলেছিলেন "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।"

**আজাদ হিন্দ সেনা বাহিনীর পরাক্রম :** নভেম্বর ১৯৪৩ সালে জাপান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জয় করে আজাদ হিন্দ সরকারের কাছে সমর্পন করেন। নেতাজী তাদেরকে যথাক্রমে 'শহীদ' ও 'স্বারাজ্য' নাম দেন। ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীরা ম্যানমারের আরাকান অঞ্চল দখল করে। আসামের পূর্ব সীমান্তের চৌকিগুলিও জিতে নেয়। এমন সময়ে জাপান থেকে আজাদ হিন্দ সেনাকে সাহায্য করা বন্ধ করাতে ইম্ফালের অভিয়ান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এমন প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা প্রানপনে লড়াই করতে থাকে। এমন সময় জাপান আত্মসমর্পন করে। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট সুভাষ চন্দ্র বসু একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। এমতোবস্থায় আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীকে অস্ত্র নিচে রাখতে হলো। এইভাবে আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর যুদ্ধের রোমহর্ষক সময়ের সমাপ্তি ঘটে।

পরে আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর অফিসারদের উপর ব্রিটিশ সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ করে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু, ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহদুর সপ্রুর মতো বিশেষজ্ঞ আইনবিদরা তাদের বাচানোর চেষ্টা করে ছিলো। কিন্তু সৈনিক আদালত ওই অফিসারদের দোষী সাব্যস্ত করে যাবদজীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত করে। এতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। অবশেষে সৈনিক আদালতের দেওয়া সাজা সরকারকে বাতিল করতে হয়।

**ভারতীয় নৌসেনাবাহিনী এবং বিমান সেনা বাহিনীর বিদ্রোহ :** আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর দ্বারা অনুপ্রানিত নৌসেনাবাহিনীর মধ্যে এবং বিমান সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ সংকারের প্রতি অসন্তোষ নির্মান হয়। তার বিস্ফোট ১৯৪৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বাই এখানে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'তলবার' এর উপর হয়। সৈন্যরা যুদ্ধজাহাজে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নারা লাগায়। ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে নৌসেনাবাহিনীর উপর গুলি চালায়। তার পাল্টা জবাব বিদ্রোহিরা গুলি চালিয়ে দেয়। মুম্বাইয়ের শ্রমিক এবং সাধারণ জনগন নৌসেনাবাহিনীকে সমর্থন করেছিলেন। অবশেষে সর্দার বল্লভভাই পটেলের মধ্যস্থতায় নৌসেনাবাহিনীরা অস্ত্র নিচে রাখেন।

মুম্বাইতে নৌসেনাবাহিনীকে সমর্থন করার জন্য বিমানবাহিনীর কর্মকর্তারা দিল্লী, লাহোর, করাচী, আম্বালা, মেরঠ ইত্যাদি স্থানে হরতাল করার ঘোষনা করে। এই বিদ্রোহ ছিলো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের ভাবনা চরম সীমায় পৌঁছানোর লক্ষণ। এভাবে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ শক্তির আধার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগনের, তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। সেনাবাহিনী, নৌসেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনী ছিল ব্রিটিশ শক্তির প্রধান আধার স্তম্ভ। তারাও এখন ব্রিটিশবিরোধী হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত ঘটনার ফলে ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পেরেছিল যে ভারতে তাদের শাসন বেশি দিন স্থায়ী হবে না।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(আন্দামান ও নিকোবর, আগস্ট ক্রান্তি, বিনোবা ভাবে)

(১) ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রথম সত্যাগ্রহী ........ ছিলেন।

(২) ১৯৪২ সালের দেশব্যাপী আন্দোলনকে ........ বলা হয়।

(৩) নভেম্বর ১৯৪৩ সালে জাপান ...... জয় করে আজাদ হিন্দ সরকারের কাছে সমর্পন করেন।

**২. নিচের উক্তিগুলি কারনসহ ব্যাখ্যা করো।**

(১) ১৯৩৯ সালের নভেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

(২) আজাদ হিন্দ সেনাকে অস্ত্র নিচে রাখতে হয়েছিল।

(৩) সমানান্তর সরকার জনগনের জন্য অনুপ্রেরনার জায়গা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

**৩. নিম্নলিখিত তালিকা পূর্ণ করো।**

| সংগঠন | সংস্থাপক |
|---|---|
| ফরওয়ার্ড ব্লক | |
| ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ | |
| তুফান সেনাবাহিনী | |

**৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো।**

(১) শিরীষ কুমারের কাজ তোমাদের জন্য কতটা অনুপ্রেরনাদায়ক ?

(২) স্টৈফোর্ড ক্রিপসকে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চর্চিল ভারতে কেনো পাঠালেন ?

(৩) জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেফতারের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো ?

**উপক্রম**

(১) আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধের ঘটনাগুলির একটি সময়রেখা তৈরি করো।

(২) ইন্টারনেটের সাহায্যে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ছবি সংগ্রহ করে জাতীয় দিবস উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

# ১০. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নানাভাবে আন্দোলন হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছিলো 'সশস্ত্র বিপ্লব'। আমরা এই পাঠে এই সম্পর্কে পরিচয় করে নেবো।

১৮৫৭ সালের আগে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে করা বিদ্রোহ এবং আমরা ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি। তার পরের সময়কালে রামসিং কোকা পাঞ্জাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন।

**বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে :** বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে মহারাষ্ট্রে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান। তিনি এটা ধারোনা করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবল অস্ত্র দিয়েই করা উচিৎ। তিনি ওস্তাদ লহুজী সালভের নিকট হইতে শস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার জন্য রামোশি ভাইদের সংগঠিত করে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ সরকার তাকে এডেনের কারাগারে পাঠায়। ১৮৮৩ সালে তিনি সেখানেই মারা যান। স্বাধীনতার জন্য তিনি সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন।

বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে

**চাফেকর ভাই (বন্ধু) :** ১৮৯৭ সালে পুনেতে প্লেগ মহামারীর ব্যবস্থা করার সময় প্লেগ কমিশনার র‍্যান্ড অন্যায় এবং অত্যচার করেছিলেন। প্রতিশোধ হিসেবে দামোদর, বালকৃষ্ণ এবং চাফেকর ভাই ২২ শে জুন ১৮৯৭ সালে র‍্যান্ডকে হত্যা করে। দামোদর, বালকৃষ্ণ এবং বাসুদেব এই তিনভাই ও তাদের সহকর্মী মহাদেব রানডেকে ফাঁসি দেওয়া হয়। একই পরিবারের তিন ভাই দেশসেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এই সময়ে বিহারের মুন্ডা আদিবাসীরা বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে বিদ্রোহ করে।

**অভিনব ভারত :** ১৯০০ সালে স্বতন্ত্রবীর বিনায়ক দামোদর সাভরকর নাশিকে মিত্রমেলা নামের একটি বিপ্লবীদের গুপ্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০৪ সালে এই সংগঠনের নাম 'অভিনব ভারত' রাখা হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য সাভরকর ইংল্যান্ডে যান। সেখান থেকে তিনি অভিনব ভারত সংগঠনের ভারতীয় সদস্যদের বিপ্লবী সাহিত্য, পিস্তল ইত্যাদি সামগ্রী পাঠাতে লাগলেন। তিনি বিখ্যাত ইতালীয়ন বিপ্লবী জে াসেফ ম্যাজিনির অনুপ্রেরনামূলক চরিত্র লিখেছেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ এটি প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিলো। তিনি "১৮৫৭ চে স্বাতন্ত্রসমর" (১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধ) গ্রন্থটি লিখেছেন এইরূপ বলা হয়েছে।

স্বতন্ত্রবীর বি.দা.সাভরকর

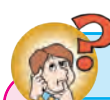

**তুমি জানো কি ?**

স্বা.সাভরকরকে পঞ্চাশ বছেরের সশ্রম কারাদণ্ডে শাস্তি ভোগ করতে আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সেখানে দশ বছর ছিলো। সাভরকরের আত্মজীবনী "মাঝী জন্মঠেপ" (আমার আজিবন কারাবাস) তিনি আন্দামানের সেই ভয়ঙ্কর দিনের অভিজ্ঞতাগুলির কথা এই আত্মজীবনীতে লিখে রেখেছেন। পরে সরকার তাকে রত্নাগিরিতে নিয়ে যায় এবং সেখানে স্থানবদ্ধ করে রাখে। সেখানে সাভরকর জাতিভেদ নির্মুলন, অস্পৃশ্যতা নিবারন, সহভোজন, ভাষা শুদ্ধিকরনের মতো সামাজিক আন্দোলন করে। তিনি একজন মহৎ সাহিত্যিক ছিলেন। ১৯৩৮ সালে মুম্বাইতে আয়োজীত মারাঠি সাহিত্য সম্মেলনের তিনি সভাপতি ছিলেন।

সরকার অভিনব ভারত সংগঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সুচনা পায়। তাই সরকার বাবারাও সাভরকরকে গ্রেফতার করে। তাকে যাবদজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই শাস্তির প্রতিশোধ নিতে অনন্ত লক্ষ্মন কানহেরে নাশিকের কালেক্টর জ্যাকসনকে হত্যা করেন। সরকার অভিনব ভারত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে শুরু করে। সরকার জ্যাকসনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা স্বতন্ত্রবীর সাভরকরের সাথে যুক্ত করে এবং তাকে বন্দী করে তার বিরুদ্ধে মামলা চালায়। আদালত তাকে পঞ্চাশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

**বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন :** বঙ্গভঙ্গের পর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অধীক তীব্র হয়ে ওঠে। স্থানিয় বিদ্রোহের জায়গায় রাষ্ট্রিয়স্তরে ব্যাপকবিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী চিন্তাধারায় প্রভাবিত যুবকরা তাদের নিজের গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে। তাদের উদ্দ্যেশ ছিলো ব্রিটিশ অধিকারিদের ভয় দেখানো, বৃটিশ শাসনকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি লাগা ভয়-ভীতি দূর করা, এবং ব্রিটিশ সম্রাজ্যকে উল্টে দেওয়া।

বাংলায় বিপ্লবী সংগঠন রূপে 'অনুশীলন সমিতি কাজ করছিলেন। অনুশীলন সমিতির পাঁচ শতাধিক শাখা ছিল। এই সংগঠনের প্রধান ছিলেন অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষের পরামর্শ ও নির্দেশনা এই সংগঠনের প্রাপ্ত হয়। এই কমিটির বোমা তৈরির কেন্দ্র, কলকাতার কাছে মানিকতলা এখানে ছিলো।

১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বোস এবং প্রফুল্ল চাকী এই অনুশীলন কমিটির সদস্যরা কিংসফোর্ড নামের বিচারককে হত্যার চক্রান্ত করেন, কিন্তু তারা যে গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে সেই গাড়িটি কিংসফোর্ডের ছিলো না। এই হামলায় গাড়িতে থাকা দুই ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু হয়। ব্রিটিশরা যাতে ধরতে না পারে তাই প্রফুল্ল চাকী গুলি করে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম বোস পুলিশের হাতে ধরা পড়ে । তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই মামলার তদন্ত করতে গিয়েই অনুশীলন কমিটির কাজের কথা পুলিশে জানতে পারে। তারা এই সংগঠনের সদস্যদের গ্রেফতার করা শুরু করে। সরবিন্দ ঘোষকেও গ্রেফতার করা হয়। বোমা তৈরির সঙ্গে অরবিন্দ বাবুকে যুক্ত করতে সরকার বিফল হয় এবং তাকে নির্দোষ মুক্তি দেয়। অন্যান্য সদস্যদের দীর্ঘ অবধি পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রাসবিহারী বোস এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বাংলার বাইরেও বিপ্লবী সংগঠনের জাল (নেটওয়ার্ক) ছড়িয়ে দেন। পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশে বিপ্লবি কার্যের কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ভাইসরায় লার্ড হার্ডিঞ্জের দিকে বোমা নিক্ষেপের সাহসী কাজটি রাশবিহারী বোস এবং তার সহযোগীরা করেছিলেন কিন্তু লার্ড হার্ডিঞ্জ আক্রমন থেকে বেঁচে যান।

মাদ্রাজ প্রান্তেও বিপ্লবীকার্য শুরু ছিলো। বিপ্লবী বাঞ্চি অইয়ার য়াশ নামে এক ব্রিটিশ অফিসারকে হত্যা করেছিলেন। তারপর তিনি নিজেই গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

**ইন্ডিয়া হাউস :** বিদেশে থাকা ভারতীয় বিপ্লবীরা, ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউস এই ধরনের সহায়তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিলো। পন্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা একজন ভারতীয় দেশপ্রেমিক দ্বারা ইন্ডিয়া হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংস্থার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে ভারতীয় যুবকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য শিষ্যবৃত্তি প্রদান করা হয়। স্বাতন্ত্রবীর সাভবকর এমন শিষ্যবৃত্তি পেয়েছিলেন। জার্মানের স্টুটগার্ডে

পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা

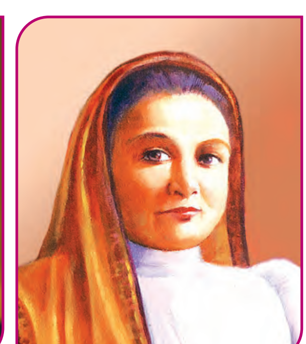
মাদাম কামা

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে মাদাম কামা ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উপস্থিত করে। এই সম্মেলনেই তিনি ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ইন্ডিয়া হাউসের সাথে যুক্ত আরেকজন যুবক বিপ্লবী তার নাম মদনলাল ধিংড়া ছিলো। তিনি কার্জন ওয়াইলি নামে এক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করেন। সেই জন্য ধিংড়াকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

**গদর (বিদ্রোহ) আন্দোলন:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন গতি পায়। বিপ্লবী ভেবেছিলেন যে ব্রিটিশ শত্রুদের সহায়তায় ভারতে সত্তা পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে বিপ্লবী সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে 'গদর' একটি প্রধান সংগঠন ছিলো।

'গদর' সংগঠনটি আমেরিকা এবং কনাডায় বসবাসকারী ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লালা হরদয়াল, ভাই পরমানন্দ, ডা. পান্ডুরং সদাশিব খানখোজে ইত্যাদি ক্রান্তিকারকরা এই সংগঠনের প্রধান নেতা ছিলেন। 'গদর' মানে বিদ্রোহ। এই সংগঠনের মুখপত্রের নাম 'গদর' ছিলো। এই মুখপত্রে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কু-প্রভাবকে স্পষ্ট করা হয়েছে। ভারতীয় বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক অভিযানের খবর পাওয়া যেতো। এভাবে 'গদর' এর মাধ্যমে ভারতিয়দের কাছে দেশপ্রেম ও সশস্ত্র বিপ্লবের বার্তা পৌছে দেওয়া হয়।

'গদর' সংগঠনের নেতারা যুদ্ধ, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা পাঞ্জাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেনাবাহিনীতে থাকা ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রাশবিহারী বোস এবং বিষ্ণু গনেশ পিঙ্গলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করবেন। কিন্তু কোনো এক সন্ধান দাতার কারনে, ব্রিটিশরা এই পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সূত্র পায়। পিঙ্গলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাশবিহারী বসু পালিয়ে যেতে সফল হন। তিনি জাপানে গিয়ে তার বিপ্লবী কাজ চালিয়ে যান।

যুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশে অনেক জায়গায় বিপ্লবী আন্দোলন চলছিল। বর্লিনে বিরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন দত্ত এবং হরদয়াল জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সহায়তায় ব্রিটিশবিরোধী পরিকল্পনা তৈরি করেন। ১৯১৫ সালে মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লা এবং ওবিদুল্লাহ সিন্ধি কাবুলে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন।

**কাকোরি ষড়যন্ত্র :** সরকার দমননীতি অনুসরণ করলেও বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ন্ত্রনে আসেনি। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করার পর, অনেক তরুণ বিপ্লবের পথে ঝুঁকে পড়ে। চন্দ্রশেখর আজাদ, রাম প্রসাদ বিসমিল, যোগেশ চ্যাটার্জি, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ইত্যাদি বিপ্লবীরা একত্রিত হন। ৯ আগস্ট ১৯২৫ সালে উত্তর প্রদেশের কাকোরি রেল স্টেশনের কাছে বিপ্লবী কর্মকান্ডের প্রয়োজনিয় অর্থ সংগ্রহের জন্য রেলে নেওয়া সরকারি কোষাগার লুট করা হয়। একে কাকোরি ষড়যন্ত্র বলা হয়। সরকার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় এবং বিপ্লবীদের বন্দী করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। অশফাক উল্লাহ খান, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং এবং রাজেন্দ্র লাহিরীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি।

চন্দ্রশেখর আজাদ

ভগৎ সিং

**হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন :** সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত যুবকরা একটি দেশব্যাপী বিপ্লবী সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেব ইত্যাদি যুবকরা এর মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। এই সমস্ত বিপ্লবীরা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সাথে যুক্ত ছিলেন।

রাজগুরু

সুখদেব

১৯২৮ সালে, দিল্লির ফিরোজশাহ কোটলা মাঠে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই যুবকরা 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসেসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ শোষন থেকে ভারতকে মুক্ত করাটাই সংগঠনের লক্ষ্য ছিলো। একই সাথে এই সংগঠনটি কৃষক এবং শ্রমিকদের শোষনকারী অন্যায় সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উল্টাতে চেয়েছিল। ভগৎ সিং সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।

অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা, এমন কাজগুলি এই সংস্থার একটি পৃথক বিভাগকে অর্পন করা হয়েছিল। এই বিভাগের নাম ছিলো ‘‘হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি’’ এবং এর প্রধান ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ।

এই সংগঠনের সদস্যরা অনেক বিপ্লবী কাজ করেন। ভগৎ সিং এবং রাজগুরু লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সন্ডার্স অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেন।

এই সময় সরকার নাগরিদের অধিকার লঙ্ঘনকারী দুইটি বিধায়ক বিল কেন্দ্রীয় পরিষদে উপস্থাপন করে। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত সেই বিধায়ক বিলের বিরোধিতা করতে কেন্দ্রীয় পরিষদে বোমা নিক্ষেপ করে।

সরকার অবিলম্বে হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মির ঘাঁটিতে হামলা চালায়। সন্ডার্সের হত্যার ক্লু (সূত্র) পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। সরকার বিপ্লবীদের গ্রেফতার শুরু করে। তাদের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা চালানো হয়। ২৩ মার্চ ১৯৩১ সালে লাহোরের জেলে ভগৎ সিং রাজগুরু এবং সুখদেবকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

চন্দ্রশেখর আজাদ শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। পরে এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে তিনি শহীদ হন।

**চট্টগ্রাম শস্ত্রাগার আক্রমণ :** সূর্য সেন, বাংলার চট্টগ্রামের একটি বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। তিনি তার নিজের চারপাশে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা বড্ডেদারের মতো অনুগত বিপ্লবীদের একটি বাহিনী জড়ো করেন। তাদের সহায়তা নিয়ে সূর্য সেন চট্টগ্রামের শস্ত্রাগারে হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের দুইটি শস্ত্রাগারে সংগ্রহিত অস্ত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেয়। তারা টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ভাংচুর করে তারা যোগাযোগের ব্যবস্থা বন্ধ করতে সফল হয়েছিলেন। এরপর তারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাথে একটি রোমাঞ্চকর সংগ্রাম করেন।

সূর্য সেন

কল্পনা দত্ত

প্রীতিলতা বড্ডেদার

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন এবং তার কয়েকজন সহযোগী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সূর্য সেন এবং তার বারো জন সহযোগীকে

ফাঁসি দেওয়া হয়। কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রীতিলতা বড্ডেদারকে পুলিশ না ধরতে পারে তাই সে আত্মত্যাগ (আত্মহত্যা) করেন।

চট্টগ্রামে বিদ্রোহের কারণে বিপ্লবী আন্দোলন গতি পায়। দুইজন বিদ্যালয়ের ছাত্রী-শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী জেলা জজকে হত্যা করেছিলেন, তখন বিনা দাস নামে এক যুবতী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে গভর্নরের উপর গুলি চালায়। এভাবে সেই সময় অনেক বিপ্লবী ঘটনা ঘটে।

ওডভায়র নামে অফিসার জালিয়ান ওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিলেন। সরদার উধম সিং তাকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে হত্যা করেন।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। ব্রিটিশ শক্তির সাথে যুদ্ধ করে বিপ্লবীরা সাহস এবং দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। তাঁদের দেশপ্রেম এবং নিষ্ঠা ভাবনা অতুলনীয় ছিলো। তাঁদের আত্মত্যাগ ভারতীয়দের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিলা।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, মিত্রমেলা, রামসিং কোকা)

(১) স্বতন্ত্রবীর সাভরকর ......... নামে বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

(২) পাঞ্জাবে ......... সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন।

(৩) ......... ইন্ডিয়া হাউস প্রতিষ্ঠা করেন।

**২. নিম্নলিখিত তালিকা পূর্ণ করো।**

| বিপ্লবী | সংগঠন |
|---|---|
| .................... | অভিনব ভারত |
| বারীন্দ্র কুমার ঘোষ | .................... |
| চন্দ্রশেখর আজাদ | .................... |

**৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।**

(১) চাফেকর ভাইরা (বন্ধুরা) র‍্যান্ডকে হত্যা করে।

(২) ক্ষুদিরাম বোসকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

(৩) ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় বিধানসভায় বোমা নিক্ষেপ করেন।

**৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর সক্ষেপে লেখো।**

(১) চট্টগ্রাম শস্ত্রাগার আক্রমণের বিষয়ে বিবরণ লেখো।

(২) সশস্ত্র বিপ্লবে স্বতন্ত্রবীর সাভরকরের অবদান বিষয়ে ব্যাখ্যা করো।

**উপক্রম**

(১) বিপ্লবীদের জীবনী ভিত্তিক ছায়াচিত্র নাটক দেখো। এতে যে পর্ব তোমার ভালো লেগেছে, তাহা শ্রেনীতে নাট্যিকরন করো।

(২) বিপ্লবীদের গল্পের উপর ভিত্তি করে হস্তলেখ তৈরি করো।

# ১১. সমতার লড়াই

আধুনিক ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম গুরুত্বপুর্ণ ছিল। এই সংগ্রাম ছিল মানবমুক্তির বৃহওর দর্শনের উপর ভিত্তি করে। তাই এই সংগ্রামের ধারায় রাজনৈতিক পুঁজিবাদের পাশাপাশি সামন্তবাদ, সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষনেরমতো বিষয়গুলোরও বিরোধিতা হতে থাকে। সাম্যেরে নীতিও স্বাধীনতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সেই দৃষ্টিকোন থেকে কৃষক, শ্রমিক, নারী, দলিত প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তির দ্বারা শুরু হওয়া আন্দোলন এবং সাম্যকে গুরুত্ব দেওয়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অবদান মল্যবান হয়ে ওঠে। এটা অনুধাবন না করে আমরা আধুনিক ভারতের জটিলতা উপলব্ধি করতে পারব না। তাই আমরা কিছু আন্দোলনের অধ্যয়ন করব।

**কৃষক আন্দোলন :** ভারতীয় কৃষকদের ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির দুষ্পরিনাম ভোগ করতে হয়েছিল। ভূস্বামী এবং মহাজনরা ব্রিটিশ সরকার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তারা কৃষকদের প্রতি অবিচার করত। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কৃষকরা অনেকবার বিক্ষোভ করেছে। বাংলায় কৃষকরা একটি কৃষি সমিতীগঠন করে নীল উৎপাদনের বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পন’ নাটকটি নীল চাষীদের দুর্দশা সমগ্র সমাজের নজরে এনেছিল। ১৮৭৫ সালে, মহারাষ্ট্রের কৃষকরা জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি মহান বিদ্রোহ করেছিলেন। বাবা রামচন্দ্রের উদ্যোগে ১৯১৮ সালে উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা ‘কিশান সভা’ নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। কেরালায় মোপলা চাষিরা বড় ধরনের বিদ্রোহ করে। ব্রিটিশ সরকার দ্বারা এই বিদ্রোহকে চুর্ন করা হয়।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রা.এন.জি.রাঙ্গার উদ্যোগে ‘অখিল ভারতীয় কিষান সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতি ছিলেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী। এই বৈঠকে জাতীয় পরিষদে কৃষকদের অধিকারের ঘোষনাপত্র পেশকরা হয়। ১৯৩৬ সালে মহারাষ্ট্রের গ্রামীন এলাকার ফৈজপুর এখানে জাতীয় পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হাজার হাজার কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

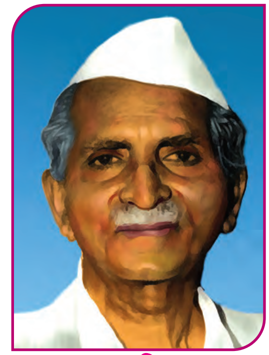

প্রা.এন.জি.রঙ্গা

সানে গুরুজী

১৯৩৮ সালে পূর্ব খানদেশে অতিবৃষ্টির কারনে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। এমত অবস্থায় কৃষকদের খাজনা মুকুফের জন্য সানে গুরুজী বিভিন্ন জায়গায় মিটিং মিছিল করেন। কালেক্টরের কার্যালয়ে বিক্ষোভ করে। ১৯৪২ সালের বিপ্লবে বিপুল সংখ্যক কৃষক যোগ দিয়েছিলেন।

**তুমি জানো কি ?**

সানে গুরুজী কৃষক শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ধুলে-অমলনের শ্রমিক সংগঠনের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিনত হউক তার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। তিনি অমলনের মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন।

দলিতদের জন্য পন্ডরপুরের বিঠ্ঠল মন্দির খুলে দেওয়ার জন্য আমরন অনশন করে ছিলেন।

**শ্রমিক সংগঠন :** উনবিংশ শতাব্দির শেষে ভারতে কাপড় মিল, রেলওয়ে কম্পানির মতো শিল্প শুরু হয়েছিল। শ্রমিক সংগঠন বড় সংখ্যায়

নারায়ণ মেঘাজী লোখন্ডে

আবির্ভূত হয়নি, তবুও এই সময়ে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল। শশীপদ বন্দোপাধ্যায় নারায়ন মেঘাজী লোখান্ডে স্থানিক পর্যায়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিলেন। শ্রম নিয়ে লোখান্ডের কাজ এতটাই মূল্যবান ছিল যে তাকে 'ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের জনক' বলে বর্ণনা করা হয়।

### তুমি জানো কি ?

নারায়ন মেঘাজি লোখান্ডের আদি গ্রাম পুনে জেলার সাসওয়াড়ের কাছে কানেসার। তিনি ১৮৯০ সালে বোম্বে মিল অ্যাসেসিয়েশন নামে একটি শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রমিক সংগঠনকে ভারতে একটি সংগঠিত আন্দোলনের সূচনা বলে মনে করা হয়। তিনি মহাত্মা ফুলে প্রতিষ্ঠিত সত্যশোধক সমাজের মুম্বাই শাখার সভাপতি ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় ১৮৯০ সালের ১০ জুন থেকে শ্রমিকরা রবিবার সপ্তাহিক ছুটি পেতে শুরু করে।

এই সময়ে আসামে চা বাগানের শ্রমিকদের দারুণ দুর্দশার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা (জী.আয়.পি.) রেলওয়ের শ্রমিকরা তাদের দাবির জন্য একটি হড়তাল ঘোষনা করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় শ্রমিকরা স্বদেশীর সমর্থনে সময়ে-সময়ে হড়তাল করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে শিল্পায়ন শ্রমিক শ্রেনীর বৃদ্ধি হয়, তবে দেশব্যাপী শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে আঁল ইন্ডিয়া ট্রেউ য়ুনিয়ান কাংগ্রেসের (আয়টক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইটিসির কাজে এন.এম.যোশীর একটি বড় ভূমিকা ছিল। লালা লাজপতরায় আইটিসির প্রথম সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি বললেন, জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহন করতে হবে।

শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মুজাফফর আহমেদ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক নেতারা শ্রমিক শ্রেনীর মধ্যে তাদের তাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার এবং তাদের জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলার কাজ করে ছিলেন। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুম্বাহিয়ের মিল শ্রমিক সংগঠন ছয় মাসের জন্য হড়তাল করে। এই ধরনের অনেক হড়তাল রেল শ্রমিক, জুঠ শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে সরকার বিচলিত হয়। এই আন্দোলন দমনের জন্য আইন প্রনয়ন করা হয়। শ্রমিকদের সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনের পরিপুরক হয়।

শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে

**সমাজবাদী আন্দোলন :** জনগনের সমাজ তান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থ রক্ষারজন্য ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করা দরকার এইরকম রাষ্ট্রীয় সভার অনেক তরুন কর্মীর মনে ধারনা হলো। এইভাবে তারা বুঝতে শুরু করে যে সমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার নীতিতে পুনর্গঠন করা উঠিত। এই সচেতনতা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উত্থান ও বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।

নাশিকের জেলে থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রসভার সমাজবাদী যুবকরা রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস সমাজবাদী কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মিনু মসানি, ডা.রামমনোহর লোহিয়া ইত্যাদি প্রমুখ নেতা ছিলেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারত ত্যাগ' আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন সমাজতান্ত্রিক

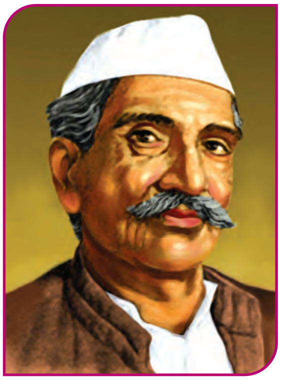

আচার্য নরেন্দ্র দেব

ডাঁ রামমনোহর লোহিয়া

যুবকরা।

ভারতীয়রা কার্ল মার্কস এবং তার সাম্যবাদের সাথে পরিচিত হতে লাগল। লোকমান্য তিলক ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে মার্ক্স সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে সাম্যবাদের প্রভাব অনুভব হতে থাকে। মানবেন্দ্রনাথ রায় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে জাড়িত ছিলেন।

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে সাম্যবাদ সংগঠন গঠিত হয়। সাম্যবাদ যুবকেরা শ্রমিক-কৃষকদের জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলে। সরকার সাম্যবাদ আন্দোলনের জন্য অসহিষ্ণু বোধ করতে লাগলেন। সরকার এই আন্দোলন দমন করার সিদ্ধান্ত নিল। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মূজাফ্ফর আহমদ, কেশব নীলকান্ত জোগলেকার প্রমুখকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হয়। তাদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হল। এর বিচার চলছিল মিরাটে। তাই একে 'মিরাট কাট কেস' বলা হয়। মিরাটের বিচারের পরও সাম্যবাদির এই আন্দোলনের প্রভাব বজায় ছিল।

**নারী আন্দোলন :** ভারতীয় সমাজে নারীদের গৌন স্থান রয়েছে। অনেক খারাপ নিতি-রিতির কারনে তাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, কিন্তু আধুনিক যুগে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বেড়েছে। নারী সংক্রান্ত আন্দোলনে কিছু পুরুষ সংস্কারক নেতৃত্ব করেছিলেন। কালক্রমে নারী নেতৃত্বের আবির্ভাব হতে থাকে। তাদের স্বাধীন সংগঠন ও গড়ে ওঠে। পন্ডিতা রমাবাই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আর্য মহিলা সমাজ' ও 'শারদাসদন' এবং রমাবাই রানডে প্রতিষ্ঠিত 'সেবাসদন' এই প্রতিষ্ঠান গুলো তার উদাহরন। 'ভারত মহিলা পরিষদ' (১৯০৪) এবং 'সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন' (১৯২৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এই প্রতিষ্ঠানিক কাজ জাতীয় পর্যায় পৌছায়। এই রমাবাই রানডে সংগঠনের মাধ্যমে নারীরা উওরাধিকার, ভোটের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সং গ্রাম শুরু করে।

পন্ডিতা রমাবাই

রমাবাই রানডে

রখমাবাই জনার্ধন সাভে হলেন প্রথম মহিলা ডাক্তার যিনি ভারতে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। তিনি মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর বক্তৃতা করতেন। তিনি রাজকোটে রেডক্রস সোসাইটির একটি শাখাও খুলেছিলেন।

ডাঁ.রখমাবাই সাভে

বিংশ শতাব্দীতে জনজীবনে নারীর অং শগ্রহন বাড়তে থাকে। জ াতীয় আন্দোলন ও বিপ্লাবে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আইনের অনুযায়ী প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় নারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানে লিঙ্গ সমতার নীতি সুস্পষ্ঠভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

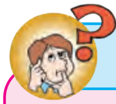

### তুমি জানো কি ?

**ডাঃ আনন্দীবাই জোশী :** প্রথম ভারতীয় মহিলা ডাক্তার ১০ দিন বয়সে তার ছেলে মারা যায়। এই দুঃখ তাঁকে চিকিৎসা শিক্ষার প্রতি টানে। মার্চ মাসে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এম.ডী.ডিগ্রী প্রাপ্ত করেন। ভারতে ফিরে আসার পর আনন্দীবাই যক্ষ্ম রোগে আক্রান্ত হন। পরে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ ফেব্রুয়ারি পুনেতে তিনি মারা যান।

ডাঃ আনন্দীবাই জোশী

**দলিত আন্দোলন :** ভারতের সমাজ রচনা বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে ছিল। মহাত্মা জোতিরাও ফুলে, নারায়ণ গুরু এবং সমাজ সংস্কারকেরা সমাজে দলিতদের প্রতি অন্যায় আচরনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন। মহাত্মা ফুলের শিক্ষা অনুসরন করে গোপালবাবা ভালংকার এবং শিবরাম জানবা কাম্বলে অস্পৃশ্যতা দূরীকরনের কাজ চালিয়ে ছিলেন। গোপালবাবা ভালংকার ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার 'বিটাড় বিধ্বসন' গ্রন্থে অস্পৃশ্যতা খণ্ডন করেন। শিবরাম জানবা কাম্বলে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জুলাই 'সোমবংশীয় মিত্র' পত্রিকা শুরু করেন। মুরলী (দেবদাসী), ও যোগতিনীর (যোগিনি) প্রশ্নও তুলে ধরলেন। তদ্রুপ দেবদাসীদের বিয়ের উদ্যোগেও তিনি অগ্রসর হলেন। তামিলনাড়ুতে পেরিয়ার রামস্বামী অস্পৃশ্যতা নির্মূলনের জন্যও আন্দোলন শুরু করলেন।

মহর্ষি বিঠল রামজি শিন্দে দলিতদের অগ্রগতির জন্য ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে 'ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন' শুরু করেন। দলিতদের আত্মমর্যাদাশীল, শিক্ষিত এবং উদ্যোগী করা তাদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, সেই কাজের আর একটি অংশ ছিল উচ্চবর্ণের মানুষের মনে দলিতদের সম্পর্কে যে ভূল ধারনা রয়েছে তা দূর করা এই জন্য তিনি মুম্বাইয়ের দেবনার, পরল এই অঞ্চলে মারাঠী বিদ্যালয়, উদ্যোগবিদ্যালয় শুরুকরেছিলেন। তিনি পুনের পার্বতী মন্দিরে প্রবেশ সত্যাগ্রহ, দলিত কৃষক পরিষদ, যৌথ নির্বাচনী প্রকল্প ইত্যাদি নিয়ে দলিতদের স্বার্থে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মহর্ষি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করেছিলেন।

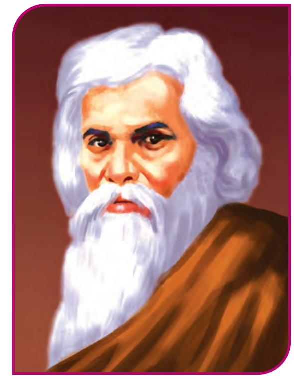

মহর্ষি বিঠ্‌ঠল রামজী সিন্দে

রাজর্ষি শাহু মহারাজ ডাঁ.বাবাসাহেব আম্বেডকরের নেতৃত্ব সমর্থন করেন। তিনি তার সময়ে গঠিত অ.ব্রাহ্মন আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। রাজর্ষি শাহু মহারাজ কোলহাপুর সংস্থায় আরক্ষনের বিপ্লবী ইশতেহার জারি করেন। বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ্যা আইন প্রনয়ন করেন। তিনি জাতিভেদ দুর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। বর্ন প্রথায় তিনটি বিধি নিষেধ ছিল, রুটি নিষিদ্ধ, বেটি নিষিদ্ধ এবং ব্যবসায় নিসিদ্ধ। এ ব্যাপারে শাহু মহারাজ সভা-সম্মেলন থেকে দলিত জনগনের হাত থেকে খাবার নিয়ে প্রকাশ্যে রুটির উপর নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে দেন। শাহু মহারাজের অভিমত ছিল যে যতদিন সমাজে বেটিবন্দী নিষিদ্ধ থাকবে ততদিন জাতপাতের বৈষম্যদূর হবে না। তিনি তার রাজত্বে আন্তঃজাতিগত বিবাহকে বৈধ করার জন্য একটি আইন পাস করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ তারিখে কোলহাপুর সরকারের গেজেটে একটি ঘোষনা প্রকাশিত হয় এবং রাজ্যে 'বালুতেদারী প্রথা' বিলুপ্ত করা হয়। যে কোনো ব্যবসা, যে কোনো মানুষকে করতে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হল। শাহু মহারাজ মানুষকে ব্যবসায়িক স্বাধীনতা দিয়ে এক ধরনের সামাজিক

রাজর্ষি শাহু মহারাজ

ঠক্কর বাপ্পা

দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন।

দক্ষিণ ভারতে জাস্টিস পক্ষ সামাজিক সমতা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মহাত্মা গান্ধি অস্পৃশ্যতার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং কাংগ্রেস পাটির মঞ্চে উত্থাপন করেন। য়েরবড়া জেলে থাকা কালীন, সনাতনি হিন্দু পন্ডিতদের সাথে তর্ক করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে অস্পৃশ্যতা কোনো শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করেনাই। তিনি হরিজন সেবক সংঘকে অনুপ্রানিত করেছিলেন। তাঁর দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে, অমৃতলাল বিঠলদাস ঠক্কর অর্থাৎ ঠক্কর বাপ্পা, আপ্পাসাহেব পটবর্ধন প্রমুখের মতো কর্মি সমতার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ডাঁ.বাবাসাহেব আম্বেডকারের নেতৃত্বে দলিত সংগ্রাম শুরু হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতিতে সমাজ গড়াড় জন্য ডাঁ.বাবাসাহেব আম্বেডকরের লক্ষ্য ছিল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে জাতিভেদ প্রথা নির্মূল না হলে দলিতদের প্রতি অবিচার ও অসমতার অবসান হবে না, তিনি বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক সমতা দলিতদের অধিকার আত্মসম্মানের উপর ভিত্তিক করে আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন। এই ভূমিকায় তিনি ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে ‘বহিস্কৃত হিতকারিনী সভা’র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিতার অনুগামীদের অনুপ্রেরনা মূলক বার্তা দিয়েছিলেন, শিক্ষিত হও, ঐক্যবদ্ধ হও এবং লড়াই করো।

বাবাসাহেব বোলে মুম্বাই প্রান্তের বিধান সভায় সার্বজনিক জলকুণ্ড এবং জলাশয় অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দেওয়ার জন্য একটি বিল পাস করেছিলেন। তবুও বাস্তবে দলিতদের জন্য জলকুণ্ড খুলে দেওয়া হয়নি বলে ডা.বাবাসাহেব আম্বেডকর এবং তাঁর অনুগামীরা মাহাড়ে চাভদার তালাবে একটি সত্যাগ্রহ করে। তারা অসমতাকে সমর্থন করা ‘মনুস্মৃতি’ কে পোড়ায়। নাসিকের কালারাম মন্দিরে দলিতদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে সত্যাগ্রহ শুরু করে। এই সত্যাগ্রহের নেতৃত্বে ছিলেন কর্মবীর দাদাসাহেব গায়কওয়াড।

সংবাদিক পত্রগুলি ছিল ডাঁ.বাবাসাহেব আম্বেডকরের আন্দোলনের অভিন্ন অঙ্গ। সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি ও দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য

মাহারদের সুস্বাদূ তালাবের সত্যাগ্রহ

ডাঁ.বাবাসাহেব আম্বেডকর 'মুকনায়ক' 'বহিস্কৃত ভারত', 'জনতা' এবং 'সমতা' এর মতো সংবাদপত্র শুরু করেছিলেন।

ডাঃ বাবাসাহেব আম্বেডকর 'স্বাধীন মজুর পক্ষ' প্রতিষ্ঠা করেন। আইন সভায় এমন আইনের বিরোধিতা করেছিলেন যা শ্রমিকদের পক্ষে নয়। তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে দলিতদের সমস্যাগুলির কার্যকরভাবে সমাধানের জন্য 'শেডুল্স কাস্ট ফেডারেশন' গঠন করেন। আধুনিক ভাবতে সমতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনে ডাঃবাবাসাহেব আম্বেডকর সংবিধানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ও অবদান রেখেছিলেন। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নাগপুরে তাঁর অনেক অনুগামীদের সাথে নিয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করেছিলেন যা মানবতা এবং সমতার পক্ষে ছিল।

আধুনিক ভারতের নির্মানে সমতার জন্য সংগ্রাম এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(লালা লাজ পাতরায়, সানে গুরুজী, রখমাবাই, জনার্দন সাভে)

(১) রাজকোটে রেডক্রস সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ......... করেন।

(২) অমলনের মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি .......... ছিলেন।

(৩) আয়টকের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ........ ছিলেন।

**২. টিপ্পনী লেখো।**

(১) মহর্ষি বিঠ্ঠল রামজি শিন্দের সামাজিক কাজ।

(২) কোলহাপুর সংস্থায় রাজর্ষি শাহু মহারাজের করা উন্নতি।

**৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।**

(১) সরকার সাম্যবাদী আন্দোলনকে দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

(২) ডাঃ বাবাসাহেব আম্বেডকর মুকনায়ক, বহিস্কৃতভারত প্রকৃতি সংবাদপত্র শুরু করেন।

(৩) দেশব্যাপী শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজন বোধ হতে লাগল।

**৪. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ।**

(১) আধুনিক ভারতের নির্মিতিতে সাম্যের লড়াই কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

(২) পূর্ব খান দেশে সানে গুরুজী কাজ লেখ।

(৩) শ্রমীকদের সংগ্রাম কীভাবে জাতীয় আন্দোলনের পরিপুরক হয়েছিল?

(৪) নারীবাদির সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

**উপক্রম**

(১) ডাঁ আনন্দীবাই জোশীরজীবনের উপর একটি বই পড়ো।

(২) রাজর্ষি শাহু মহারাজের চরিত্র পড়ো।

# ১২. স্বাধীনতা অর্জন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা ব্যাপকতাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের স্বাধীনতার দাবি বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পেরেছিল যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার প্রয়োজন আছে। সেই বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রনয়ন শুরু করে।

জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিতে। জাতীয় আন্দোলনে সব বর্ন ধর্মের মানুষ যোগ দিয়েছিল। 'এই আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশরা 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতি গ্রহন করে। এর ফলে 'মুসলিমলীগ' গঠিত হয়।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ডাঁ.মুহম্মদ ইকবাল একজন বিখ্যাত কবি মুসলিম রাষ্ট্রের ধারনার প্রস্তাব রাখেন। পরে চৌধুরী রহমত আলী পাকিস্তানের পরিকল্পনা রাখেন। ব্যারিস্টার মোহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের একটি স্বাধীন মুসলিম জাতি গঠনের আহ্বান জানান। রাষ্ট্রসভা শুধুমাত্র হিন্দুদের সংগঠন এতে মুসলমানরা কোনো সুবিধা পাবে না। এই ধরনের পরিকল্পনা ব্যাঁ.জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ শুরু করেছিল।

**ওয়েভেল পরিকল্পনা :** ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিধান ছিল। কিছু প্রধান বিধান ছিল যে মুসলিম, দলিত এবং সংখ্যা লঘুদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় যথাযথ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে। এবং ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী বোর্ডে হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা একই থাকবে। এই পরিকল্পনাটির বিবেচনা করার জন্য সিমলায় ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী বোর্ডে মুসলিম প্রতিনিধিদের নাম, পরামর্শ দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র মুসলিম লীগেরই থাকা উচিত, এইরুপ আগ্রহ ব্যারিষ্টার জিন্নাহ করলেন। জাতীয় পরিষদ এর বিরোধিতা করে। তাই ওয়েভেল পরিকল্পনা সফল হতে পারেনি।

**ত্রিমন্ত্রী পরিকল্পনা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, ব্রিটিশ শাসকরা ভারতকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি পার্লামেন্টে ভারতের প্রতি তার নীতি ব্যাখ্যা করেন। তদনুসারে ভারতীয় জনগনের ভারতীয় সংবিধানের গঠনের অধিকার স্বীকৃত হয়ছিল। এটাও স্পষ্ট করা হয়েছিল যে সংখ্যা লঘুদের সমস্যা ভারতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে, পথিক লরেন্স, স্টাফোর্ড ক্রিপস এবং এ.ভি.ব্রিটিশ মন্ত্রী আলেক জান্ডারের একটি প্রতিনিধি দল ভারতের নেতাদের কাছে ভারতের সম্পর্কে ইংল্যাডের পরিকল্পনা পেশ করেন। একে বলা হয় 'ত্রিমন্ত্রী পরিকল্পনা'।

এই পরিকল্পনার কিছু বিধান জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। পরিকল্পনাটি একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রদান করেনি, তাই মুসলিম লীগ অসন্তুষ্ট ছিল। ফলে ত্রিমন্ত্রী যোজনা পুরোপুরি অনুমোদিত হয়নি।

**প্রকৃত কর্ম দিবস :** পাকিস্তানের দাবি পূরন হচ্ছে না দেখে মুসলিম লীগ প্রকৃত পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তদনুসারে, মুসলিম লীগ ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ আগস্টকে প্রকৃত কর্ম দিবস হিসাবে ঘোষনা করে। এই দিনে মুসলিম লীগের অনুগামীরা হিংসক মার্গের অবলম্বন করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়। বাংলা দেশের নোয়াখালীতে ভীষন গনহত্যা সংঘটিত হয়। এই অহিংসতা বন্ধ করতে জীবনের পরোয়া না করে গান্ধীজি সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করেন।

**অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা :** এমন এক সময়ে যখন দেশে হিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল, ভাইসরয় ওয়েভেল তখন একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু ছিলেন এই সরকারের প্রধান। মুসলিম লীগ এই অস্থায়ী সরকারে প্রাথমিক ভাবে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে মুসলিম লীগ এই অস্থায়ী সরকারে যোগ দেয়। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতাদের বাধাগ্রস্ত ভূমিকার কারণে অস্থায়ী সরকার সুষ্ঠুভাবে চলতে পারেনি।

**মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা :** ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষনা করেছিলেন যে ইংল্যান্ড ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুনের আগে ভারতের উপর তার সার্বভৌমত্বত্যাগ করবে। ভারতের স্বাধীনতার পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বিশিষ্ট নেতাদের সাথে আলোচনা করেন এর পর তিনি ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক গঠনের পরিকল্পনা করেন। জাতীয় পরিষদ দেশ ভাগের বিরোধি ছিল। দেশের ঐক্য জাতীয় পরিষদের মুলভূমিকায় ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছিল। তাই দেশভাগ ছাড়া আর কোনো

উপায় ছিল না। জাতীয় পরিষদ নিরুপায়ে দেশভাগের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে।

**ভারতীয় স্বাধীনতা আইন :** মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৮ জুলাই ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের সংসদে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাস করে। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিনত হবে। এরপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো কর্তৃত্ব তাদের উপর থাকবে না। ভূখণ্ডের উপর ব্রিটিশ মালিকানা শেষ হয়ে যাবে। আইনে তাদের ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দান বা স্বাধীন থাকার বিধান রয়েছে।

**স্বাধীনতা অর্জন :** ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে ১৫ ই আগস্ট ১৯৪৭ - এ ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ এর মধ্যরাতে দিল্লির সংসদ ভবনে গনপরিষদের বৈঠক চলছিল। মধ্যরাতে বারোটা বেজেছিল এবং তখন থেকেই ভারতের পরাধিনতা সমাপ্তী হয়। ব্রিটিশদের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তার জায়গায় ভারতের তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন হয়। দেড়শত বছরের দাসত্বের পর ভারত স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতার আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ ছিল না। দেশভাগ হয়েছিল, দেশভাগ নিয়ে প্রচন্ড হিংসতা হয়েছিল, ভারতিয় জনগণের মন এই হিংসতায় ব্যথিত ছিল। গান্ধীজী স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সহভাগি ছিলেন না, তিনি তখন বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর চেষ্টা করছিলেন। ৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার মাত্র ছয় মাস পর নাথুরাম গড়্সে গান্ধিজীকে জঘন্য ভাবে হত্যা করেন। গান্ধীজি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার জন্য দিনরাত চেষ্টা করেছিলেন। এবং এর জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

## অনুশীলনী

১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।

(১) ......... অস্থায়ী সরকারের প্রধান ছিলেন।
(অ) বল্লভভাই প্যাটেল (ব) মহাত্মা গান্ধী
(ক)প.জওহরলাল নেহেরু (ড) ব্যারিষ্টার জিন্নাহ

(২) ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরির পরিকল্পনা ......... করেন।
(অ) লর্ড ওয়েভেল (ব) স্টাকোর্ড ক্রিপস
(ক) লর্ড মাউন্টব্যাটেন (ড) পথিক লরেন্স

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর এক বাক্যে লেখো।

(১) ব্যারিষ্টার জিন্নাহ কোন দাবিকে জোর দিয়ে সমর্থন করেছিলেন?

(২) ত্রিমন্ত্রী পরিকল্পনায় অংশ গ্রহনকারী মন্ত্রীদের নাম লেখো।

৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।

(১) জাতীয় পরিষদ বিভাজন অনুমোদন করেছে।

(২) অস্থায়ী সরকারের কাজ-কর্ম সুষ্ঠভাবে চলতে পারে না।

(৩) ওয়েভেল পরিকল্পনা স্বার্থক হতে পারেনী।

৪. নিচে দেওয়া কালরেখার উপর ঘটনাক্রম লেখো।

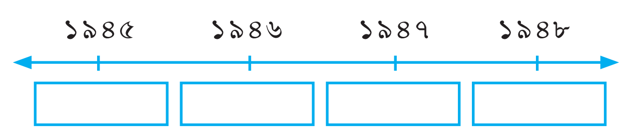


৫. নিচের প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত ভাবে উত্তর লেখো।

(১) ব্রিটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার পদক্ষেপ কেন নিয়েছিল?

(২) মাউন্টব্যাটেন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য লেখো।

(৩) ১৬ আগস্টকে প্রকৃত কৃতি দিবস হিসেবে মুসলিম লিগ কেনো ঘোষনা করেছিল ? তার পরিনতি কি হয়েছিল?

**উপক্রম**

বিভিন্ন সন্দর্ভসাহিত্য ও আন্তরজালের সাহায্যে স্বাধীনতার প্রতি সাধারন মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

# ১৩. স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্নতা

ভারত স্বাধীন হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। ভারতে অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতে যোগদান বা স্বাধীন থাকার অধিকার ছিল। তাই অখণ্ড ভারতের জাতীয় সভার স্বপ্ন পূরন হয়নি। প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীন থাকার কারন ভারতের অনেক খণ্ড হওয়ার সম্ভবনা ছিল। পর্তুগিজ এবং ফরাসি শক্তি ভারতের কিছু অংশের উপর অধিকার দখল করে রেখেছিল। কিন্তু তবুও ভারত দৃঢ় ভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধান করেছিল। আমরা এই অধ্যায়ে এই সম্পর্কে আরত্ত জেনে নেব।

সরদার বল্লভভাই প্যাটেল

**প্রতিষ্ঠান ভারতে একীভূতকরন :** ভারতে ছয়শতাধিক ছোটও বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক জাগরন শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানে প্রজামণ্ডল তৈরি হতে থাকে। প্রজামণ্ডল অর্থাৎ একটি জনসংগঠন যা প্রতিষ্ঠানে জনগনের কল্যানে এবং তাদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি সর্বভারতীয় প্রজা পরিষদ গঠিত হয়। যার ফলে সংস্থানগুলির মধ্যে আন্দোলনকে গতি দেয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বল্লভভাই প্যাটেল এই রাজ্যগুলিকে একীভূতকরনের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি অত্যন্ত কুট নৈতিক উপায় তৈরি করেছিলেন। তিনি উপনিবেশিকদের আস্থায় নিয়ে একটি "সামিলনামা" প্রস্তুত করেন যা সকলের কাছে গ্রহন যোগ্য। সরদার প্যাটেল উপনিবেশিকদের বোঝালেন যে ভারতে যোগদান তাদের সর্বোত্তম হিতকর। উপনিবেশিকরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর সংস্থান ছাড়া সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের সাথে একীভূত হয়। সরদার প্যাটেল দৃঢ় অবস্থান নেন এবং এই সংস্থানগুলির একীকরনের সমস্যা সমাধান করেন।

**জুনাগড়ের একীভূতকরন :** জুনাগড় সৌরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানের জনগন ভারতে যোগ দিতে চেয়েছিল। জুনাগড়ের নবাব অবশ্য পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার কথা ভাবছিল। জনগন তার এই বিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে তখন নবাব পাকিস্তান চলে যান। তারপর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে জুনাগড় ভারতের সাথে একীভূত হয়।

**হায়দ্রাবাদ মুক্তিসংগ্রাম :** হায়দ্রাবাদ ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ছিল। এতে তেলেগু, কন্নড়, মারাঠি ভাষী প্রদেশ ছিল। সেখানে নিজাম শাসিত প্রদেশ ছিল। সেখানে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের অভাব ছিল। নিজেদের অধিকার প্রাপ্তির জন্য হায়দ্রাবাদের লোকেরা তেলঙ্গনা অন্ধ্রপ্রদেশ, মারাঠওয়াড়ার মহারাষ্ট্র পরিষদ এবং কর্নাটকে কর্নাটক পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৮ সালে স্বামী রামানন্দ তীর্থ হায়দ্রাবাদ স্টেট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। নিজাম এই সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। হায়দ্রাবাদ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের স্বীকৃতি এবং গনতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই শুরু হয়। এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন স্বামী রামানন্দ তীর্থ, একজন জঙ্গি যোদ্ধা তার সঙ্গে ছিলেন নারায়ন রেডিড, সিরাজ-উল-হাসান তিরমিজি। পি.ভি.নরসিংহরাও এবং গোবিন্দভাই শ্রফ স্বামীজির নিষ্ঠাবান অনুগামি ছিলেন।

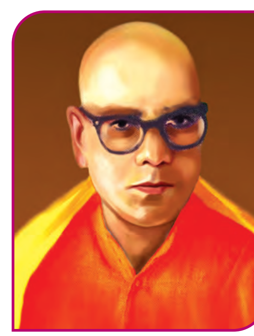
স্বামী রামনন্দ তীর্থ

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে হায়দ্রাবাদ রাজ্য কংগ্রেস হায়দ্রাবাদ সংস্থাকে ভারতের সাথে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু নিজাম ভারত বিরোধী

নীতি গ্রহন করে। তিনি হায়দ্রাবাদ সংস্থাকে পাকিস্তানের সাথে একীভূত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। নিজামের মিত্র কাসিম রাজাভি রাজাকার নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে যা ভারতে একীভূত হওয়ার জন্য সংস্থার জনগনের দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়। কাসিম রাজভি এবং তার সহযোগীরা শুধু হিন্দু নয় গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থনকারী মুসলমানদেরও নিপীড়ন করেছিল। ফলে সমস্ত জনমত রুক্ষ হতে থাকে। ভারত সরকার নিজামের সাথে আলোচনার চেষ্টা করছিল, কিন্তু নিজাম তার কদর করেনি অবশেষে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার নিজামের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান শুরু করে। ইহাকে 'আপরেশন পোলে' এই সংকেতিক নাম দেওয়া হয়। নিজাম অবশেষে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে আত্মসমর্পন করে। হায়দ্রাবাদের প্রতিষ্ঠান ভারতের একীভূত হয়। সংস্থানীর মানুষের সংগ্রাম সফল হয়। এই সংগ্রামে আর্য সমাজের বিশেষ অবদান ছিল।

**হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মারাঠওয়াড়ার অবদান :** এই সংগ্রামে স্বামী রামানন্দ তীর্থ, বাবাসাহেব পরাজ্ঞপে, গোবিন্দভাই শ্রফ, অনন্তভালেরাও, আশাতাই বাঘমারে, মানিকচাঁদ পাহাড়ে প্রমুখের অবদান ছিল।

'বন্দে মাতরম' আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্ররা হায়দ্রাবাদের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহন করে। এছাড়াও বেদপ্রকাশ, শ্যামলাল, গোবিন্দ পানসারে, বর্হিজী শিন্দে, শ্রীধর বর্তক, জনার্দন মামা, শোয়ের উল্লাহ খান, প্রমুখ হায়দ্রাবাদ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তাঁদের আত্মত্যাগ ভারতীয়দের জন্য অনুপ্রেরনা হয়ে আছে। এ থেকে দেখা যায় হায়দ্রাবাদের মুক্তি সংগ্রামে মারাঠওয়াড়ার নেতা ও জনগনের উৎকৃষ্ট ভূমিকা ছিল।

১৭ সেপ্টেম্বর, হায়দ্রাবাদ মুক্তিযুদ্ধের দিনটিকে মারাঠওয়াড়ার 'মারাঠওয়ারা মুক্তিদিন' হিসাবে পালিত হয়। ১৫ ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে মারাঠওয়াড়া স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়নি। জনগনের কঠোর সংগ্রামের পর এই অঞ্চল ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতের সাথে যুক্ত হয়।

**কাশ্মীর সমস্যা :** কাশ্মীর সংস্থার রাজা হরিসিংহ স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল পাকিস্তানের উদ্দেশ্য। এ জন্য হরিসিংহের উপর চাপ দিতে থাকে পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা পাকিস্তানের প্ররোচনায় কাশ্মীরে আক্রমন করে তখন হরিসিংহ ভারতে যোগদানের জন্য একটি যুক্তি স্বাক্ষর করে এভাবে ভারতের সাথে একীভূত হওয়ার পর কাশ্মীর রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। সেনারা অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে কাশ্মীরের বড় অংশ পুনরুদ্ধার করে। কিছু অংশ অবশ্য পাকিস্তানের দখলে থেকে যায়।

**ফরাসি উপনিবেশগুলির একীকরন :** ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও চন্দ্রনগর, পুদুচেরি, কারিকাল, মাহে এবং ইয়ানাম তখনও ফরাসিদের নিয়ন্ত্রনে ছিল। সেখানে ভারতীয় অধিবাসীরা ভারতে যোগ দিতে আগ্রহী ছিল। ভারত সরকার দাবি করেছিল যে এই অঞ্চল ভারতের একটি অংশ হওয়ার কারনে এটি ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ফ্রান্স ১৯৪৯ সালে চন্দ্রনগরে গনভোট করেছিল। সেখানকার মানুষ ভারতকে সহমত দিয়েছে। চন্দ্রনগর ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ফ্রান্স তখন ভারতের বাকি অঞ্চলও ভারতের হাতে তুলে দেয়।

ডাঁ.টি.বী.কুন্হা

**গোয়ার মুক্তিযুদ্ধ :** পুর্তুগাল অবশ্য ভারতীয় ভুখণ্ড ভারতকে দিতে অস্বীকার করে। ভারতীয়দের সেই অঞ্চলের জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ে ডাঁ.টি.বী.

কুন্হা নেতৃত্ব করেছিলেন। তিনি পর্তুগিজ সরকারের বিরুদ্ধে জন সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করেছিলেন। তিনি পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে লড়াইযের জন্য গোয়া কংগ্রেস কমিটি সংগঠিত করেন। পরে ১৯৪৫ সালে ডাঁ.কুনহা মুম্বাইতে 'গোয়া যুব লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি গোয়ায় গিয়ে ভাষন বন্ধির খাণ্ডন করেন। একারনে ডাঁ.কুনহাকে আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালে ডাঁ.রামমোহন লোহিয়া গোয়ার মুক্তির জন্য সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শুরু করেন। তিনি নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে গোয়ার মাদগাঁওতে ভাষন দেন। যে কারনে পর্তুগিজ সরকার তাঁকে নির্বাসিত করে।

এই সময়ে গুজরাটের দাদরা ও নগর হাবেলিতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলিকে মুক্ত করার জন্য 'আজাদ গোমন্তক' বাহিনী গঠিত হয়। ২ আগস্ট ১৯৫৪ সালে, এই বাহিনীর যুবকেরা সশস্ত্র অক্রমন শুরু করে এবং দাদরা ও নগর হাবেলিকে পর্তুগিজ শাসন থেকে মুক্ত করে। এই আক্রমনে বিশ্বনাথ লাভন্দে, রাজাভাই ওয়াকাঙ্কর, সুধীর ফাড়কে, নানাসাহেব কাজরেকর অংশ নিয়েছিলেন।

গোয়ামুক্তি সমিতি ১৯৫৪ সালে গঠিত হয়েছিল। এই কমিটি মহারাষ্ট্র থেকে অনেক সত্যাগ্রহীর দলকে গোয়ায় পাঠানো হয়। এর মধ্যে না.গ.গোরে, সেনাপতি বাপট, পিটার অলভারিস, মহাদেব শাস্ত্রী জোশী, ওতাঁর স্ত্রী সুধাতাই উপস্থিত হয়েছিলেন। মোহন রানাডে গোয়া মুক্তির একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগিজরা অনেক অমানবীয় অত্যাচার করে। এরফলে ভারতিয় জনমত অত্যাধিক বিক্ষুব্দ হয়েছিল।

গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম সহিংস মোড় নেয়। ভারত সরকার পর্তুগিজ সরকারের সাথে সমালোচনা করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তা সমাদৃত হয়ে ওঠেনি। অবশেষে ভারত তাদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনারা গোয়ায় প্রবেশ করে। অল্পসময়ের মধ্যেই পর্তুগিজ সেনারা আত্মসমর্পন করে। ১৯৬১ সালের ১৯ ডিসেম্বর গোয়া পর্তুগিজশাসন থেকে মুক্ত হয়। ভারতের মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পুর্নভাবে নির্মূল হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

## অনুশীলনী

১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।

(১) ভারতে ছোট-বড় ছয় শতাধিক ............ ছিল।

(অ) রাজ্য (ব) গ্রাম

(ক) প্রতিষ্ঠান (ড) শহর

(২) জুনাগড়, ............... ও কাশ্মীরবাদে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতে একীভূত হয়েছিল।

(অ) আউন্ধ (ব) ঝাশী

(ক) বড়োদরা (ড) হায়দ্রাবাদ

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।

(১) জুনাগড় ভারতের সাথে একীভূত হয়।

(২) ভারত সরকার নিজামের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা শুরু করে।

(৩) হরিসিংহ ভারতে যোগদানের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

৩. সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

(১) প্রতিষ্ঠান একীভূতকরনে সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান ব্যাখ্যা করো।

(২) হায়দ্রাবাদ মুক্তিযুদ্ধে স্বামী রামানন্দ তীর্থের অবদান ব্যাখ্যা করো।

**উপক্রম**

'হায়দ্রাবাদ মুক্তি সংগ্রাম' এই বিষয় অনুসার ছবি ও তথ্য সংগ্রহ কর। ইতিহাস কক্ষে, এই আধারে তালিকা প্রদর্শনের আয়োজন করো।

# ১৪. মহারাষ্ট্র রাজ্যের সৃষ্টি

ভারতের স্বাধীনতার পর ভাষাগত আঞ্চলিকতার ব্যাপক চাহিদা ছিল। মহারাষ্ট্রও মারাঠী ভাষী-রাজ্যের দাবি 'সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলন' ১৯৪৬ সাল থেকে করেছিল। অনেক ধারাবাহিক পরিবর্তনের পর এই আন্দোলনে ১ মে ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্যর গঠন হয়।

**পটভূমি :** বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অনেক পন্ডিত মারাঠিভাষী মানুষের শতাব্দীর একীকরনের ধারনা প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৯১১ শতাব্দিতে ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করতে হয়। সেই পটভূমিতে এন.সি.কেলকার লিখেছেন 'সমস্ত মারাঠি ভাষাভাষীদের এক নিয়মের অধীনে থাকা উচিৎ। ১৯১৫ সালে লোকমান্য তিলক ভাষাগত আঞ্চলিকতার দাবি করেছিলেন। কিন্তু সে সময় ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এই প্রশ্ন পিছিয়ে পড়েছিল।

১২ মে ১৯৪৬ সালে বেলগাও তে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে যুক্ত মহারাষ্ট্র সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাস করা হয়।

**যুক্ত মহারাষ্ট্র পরিষদ :** ২৮ শে জুলাই মুম্বাইতে শঙ্কররাও দেত্ত, এর সভাপতিত্বে 'মহারাষ্ট্র একীকরন পরিষদ' আহ্বান করা হয়েছিল। এই পরিষদে মারঠী ভাষী অঞ্চলগুলির একটি প্রদেশ তৈরী করা এবং মুম্বাই, সেন্ট্রাল প্রদেশের পাশাপাশি মারাঠওয়াড়া ও গোমান্তকের মারাঠিভাষী এলাকা থেকে মারাঠী ভাষাভাষীদের অন্তর্ভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

**দার কমিশন :** গনপরিষদের চেয়ারম্যান ডাঁ.রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৭ জুন ১৯৪৮ সালে বিচারক এস.কে.দার এঁর সভাপতিত্বে ভাষা অনুযায়ী প্রদেশের গঠনের জন্য 'দার কমিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে দার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও তাতে সমস্যার সমাধান হয় নী।

**জে.ভি.পি.(তিন সদস্যের কমিটি) :** ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক কাঠামো গঠনের পরিস্থিতি অধ্যয়নের জন্য কংগ্রেস ১৯৪৮ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর একটি কমিটি নিযুক্ত করে। এর মধ্যে জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং পট্টাভিসিতারামাইয়া এর সমাবেশ ছিল। এই তিন সদাস্যের আদ্যক্ষর থেকে জে.ভি.পি.এই কমিটিকে জানা হয়। এই কমিটি তাদের রিপোর্ট কংগ্রেসের ভাষাগত আঞ্চলিক কাঠামো নিতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। তবে এটা সঠিক সময় নয় বলে, তাঁরা সুপারিশ করেন। এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র জুড়ে তিব্রপ্রতিক্রিয়া হয়েছে। এই সময়ে জন সচেতনতার জন্য সেনাপতি বাপট প্রভাতফেরী করেছে।

আচার্য আত্রে মুম্বাই মহাপালিকায় মুম্বাই সহ যুক্ত মহারাষ্ট্রের প্রস্তাব পেশ করেন। তাহা ৫০ ভোটের মধ্যে ৩৫ জনের মতামতে অনুমোদিত হয়। এর থেকে এটা বোঝা গেল যে জনগনের 'মত হচ্ছে মুম্বাই মহারাষ্ট্রে হওয়া উচিৎ।

**রাজ্য পুনগঠন কমিশন :** ভারত সরকার ১৯৫৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ফজল আলীর সভাপতিত্বে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ১০ অক্টোবর ১৯৫৫ সালে তাদের প্রতিবেদন পরিবেশন করে। এই প্রতিবেদান মুম্বাইকে দ্বিভাষিক রাজ্য গঠনের সুপারিশ করা হয়।

**নাগপুর চুক্তি (করার) :** ১৯৫৩ সালে সমস্ত মারাঠী ভাষাভাষী মানুষের একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে পশ্চিম মহারাষ্ট্র এবং বিদর্ভ মারাঠওয়াড়া নিয়ে একটি যুক্ত মহারাষ্ট্র গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের সংশোধনী অনুসারে ৩৭১(২) অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। এইভাবে এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতে উন্নয়ন কাজের জন্য ন্যায়সঙ্গত তহবিল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার

জন্য পর্যাপ্ত তহবিল চাকুরির সুযোগ এবং নাগপুরে মহারাষ্ট্র বিধান সভার বার্ষিক অধিবেশন নাগপুর চুক্তির দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

মুম্বাইয়ের সহ মহারাষ্ট্র গঠনের জন্য মারাঠী ভাষিকদের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। মুম্বাইয়ের কামগার ময়দানে একটি বিশাল সভার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন সে সময়ে শঙ্কররাও দেও বলেছিলেন, ''আমরা মহারাষ্ট্র থেকে মুম্বাইকে আলাদা করার তীব্র বিরোধিতা করব। জনগণের ভাবনা ও চাহিদায় জনআন্দোলনের স্বরুপ শুরু হয়ে গেল। নারীরাও এতে স্বত: স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করতে লাগল। সুমতিবাই গোরে, ইসমত চুগতাই, দুর্গা ভাগবত তারা রেড্ডি, চারুশিলা গুপ্তে, কমলাতাই মোরে, সুলতানা জোহারীর মতো অনেক মহিলা আন্দোলনে অংশগ্রহন করেছিলেন।

৭ নভেম্বর ১৯৫৫ সালে শ্রমিকদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিভিন্ন কামগার সংস্থা, কমিউনিষ্ট, জনসমাজবাদী, সমাজমন্ত্রি, কৃষক শ্রমিক দল, জনসংঘের মতো অনেক রাজনৈতিক দল এতে যোগ দেয়। সভাপতিত্ব স্থানে কমরেড শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ছিলেন। এই সম্মেলনে এস.এম.জোশী একটি প্রস্তাব করেছিলেন যে মুম্বাইকে বিদর্ভসহ যুক্ত মহারাষ্ট্র হওয়া উচিৎ।

**প্রকৃত সংগ্রামের সূচনা :** মারাঠিভাষী মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। সেনাপতি বাপটের নেতৃত্বে বিধান সভার দিকে বড় পদযাত্রা শুরু হয়। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মোরারজী দেশাই। সরকার তখন নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানায়। পুলিশ পদযাত্রীদের উপর লাঠিচার্জে ও আক্রগ্যাস ব্যাবহার করে ওই দিনেই সন্ধ্যায় কামগার মর্যদানে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্দেশনা দিয়েছিলেন কমরেড ডাঙ্গে। যুক্ত মহারাষ্ট্রের সংগ্রামকে অধিক তীব্রতর করার জন্য ২১ শে নভেম্বর ১৯৫৫ শালে এক দিন ব্যাপি বন্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

**যুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি প্রতিষ্ঠা :** মারাঠা ভাষীক জনগনের যুক্ত মহারাষ্ট্রের দাবি অতি ক্লিষ্ট হতে

প্র. কে. অত্রে

লাগল। রাজ্য জুড়ে অসন্তোষের বাতাবরন গরল হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৬ সালের ৬ ফেব্রয়ারি পুনের তিলক স্মৃতি মন্দিরে কেশবরাও জেধের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিটির কার্যনির্বাহী ঘোষনা করা হয়। তদনুসারে কো.শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ্য ডাঁ.এাং.রা.নরবনে ও সচিব পদে এস.এম.জোশীর নির্বাচন হয়। সমিতীর গঠনে গ.ত্রং.মাডখোলকর, আচার্য প্র.কে.অত্রে, মধু দন্ডবতে; প্রবোধনকার কেশব ঠাকরে, য.কৃ. সোওনী, এরা মহতী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়াও সেনাপতি বাপট, ক্রান্তিসিংহ নানা পাটিল, লালজি পেন্ডসে, আহিল্যাবাই রাঙ্গানেকর যুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনে বিরাট অবদান রাখেন, এবং আন্দোলনকে মহারাষ্ট্রের গ্রাম গঞ্জপর্যন্ত নিয়ে যান।

মুম্বাই মহারাষ্ট্রের সঙ্গে মিলানো হবে না, এটা যখন স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমুল গন আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনে রাজ্য সরকারের গুলিতে ১০৬ জন নিহত হয়। পরবর্তীতে মুম্বাই য়ের ফ্লোরা ফাউন্টেনের কাছে যুক্ত মহারাষ্ট্র গঠনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই ১০৬ জন বীরপুত্রের একটি 'শহীদ স্মৃতিসৌধ' স্থাপন করা হয়েছিল।

১ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে মুম্বাই দ্বিভাষিক রাজ্য হিসেবে অস্তিত্বে আসে। তারপর ১৯৫৭ সালে লোকসভা, বিধানসভা এবং মুম্বাই পৌর

এস.এম.জোসী

প্রবোধনকর ঠাকরে

## তুমি জানো কি ?

লোকশাহির আন্নাভাউ সাঠে

শাহির অমর শেখ

শাহির দ.না.গবানকর

**মারাঠী সংবাদপত্র এবং শাহিরদের কর্মদক্ষতা :** এই আন্দোলনে সমাচারপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করেছে। প্রবোধন, কেশরী, সকাল, নবকাল, নবযুগ, প্রভাতের মতো অনেক সংবাদপত্র সচেতনতামূলক কাজ করেছে। আচার্য আত্রের পত্রিকা ‘‘মারাঠা’’ যুক্ত মহারাষ্ট্রে আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছিল। বালাসাহেব ঠাকরে ‘মাওলা’ এই ছদ্মনামে ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়ে গন আন্দোলকে আরও বেশি ব্যাপক করেছিলেন।

লোকশাহির আন্নাভাউ সাঠে, শাহির অমর শেখ এবং শাহির দ.না.দবানকর এঁদের লেখার মাধ্যমে অনেক সচেতনতা তৈরি করেছিলেন।

কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি দারুন সাফল্য পায়। এই ফলাফল স্পষ্ট করে দেয় যে জনমত দ্বিভাষিকতার বিরুদ্ধে এবং যুক্ত মহারাষ্ট্রেরপক্ষে।

প্রতাপগড়ে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অশ্বারোহী মূর্তির উন্মোচন ৩০ নভেম্বর ১৯৫৭ সালে জওহরলাল নেহরুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই সময় ভাই মাধবরাও বাগলের নেতৃত্বে যুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি বিশাল বড় মোর্চা করে। এস.এম.জোশী, না.গ.গোরে, জয়ন্তরাও তিলক, প্র.কে.আত্রে, উদ্ধবরাও পাটিল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ধবরাও পাটিল

এই কমিটি পসরানী ঘাট ও পোলাদপুরের কাছে ভিষন বিক্ষোপ করে। মারাঠি ভাষা-ভাষীদের অনুভূতি এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা পন্ডিত নেহরুর কাছে জানাতে কমিটি সাফল্য হয়েছিল।

যুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলনের কারনে, কেন্দ্র সরকার মহারাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য অনুকুল স্থিতি পেয়েছিল। এই উপলক্ষে কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দীরা গান্ধী তাঁর সম্পূর্ন শক্তি মহারাষ্ট্রের পেছনে রেখেছিল। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এই দুটি ভাষাগত রাজ্য গঠন করার অনুমতি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন। এপ্রিল ১৯৬০ সালে সংসদ মুম্বাই পুর্নগঠন আইন পাস করেন। এই আইন অনুসারে ১ মে ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠিত হয়।

১ মে ১৯৬০ - এর সকালে রাজভবনে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে পন্ডিত নেহেরু শ্রমিক দিবসে মহারাষ্ট্র রাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করেন। মহারাষ্ট্রের প্রথম মুখ্যমন্ত্রি হিসেবে যশবন্তরাও চৌহান দায়িত্ব গ্রহন করেন।

যশবন্তরাও চৌহান

# অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(১) ১ মে ১৯৬০ সালে ........ রাজ্য গঠিত হয়।

(অ) গোয়া (ব) কর্নাটক

(ক) অন্ধ্রপ্রদেশ (ড) মহারাষ্ট্র

(২) মুম্বাই মহাপালিকায় (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) মুম্বাইসহযুক্ত মহারাষ্ট্রের প্রস্তাব ........ পেশ করেছিল।

(অ) গ.এ্যং.মাডখোলকর (খ) আচার্য আত্রে

(ক) দ.বা.পোতদার (ড) শঙ্কররাও দেব

(৩) মহারাষ্ট্রের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ........ দায়িত্ব গ্রহন করেন।

(অ) যশবন্ত চৌহান (ব) পৃথিবীরাজ চৌহান

(ক) শঙ্কররাও চৌহান (ড)বিলাসরাও দেশমুখ

**২. নিম্নলিখিত প্রশ্নের কারন সহিত ব্যাখ্যা করো।**

(১) যুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(২) যুক্ত মহারাষ্ট্রের সংগ্রামে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

**৩. টিপ্পনী (নোট) লেখো।**

(১) যুক্ত মহারাষ্ট্র পরিষদ

(২) যুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির অবদান

**৪. নিচের সংকল্পনাচিত্র পূরন করো।**

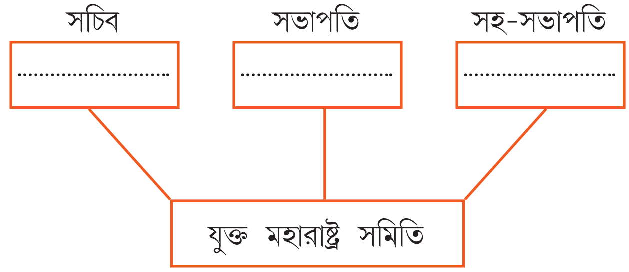


**উপক্রম**

মহারাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান, রেখেছেন, তাদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করো এবং শিক্ষকদের সাহায্যে তার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প তৈরি করো।

# নাগরিক শাস্ত্র

## (সংসদীয় ব্যবস্থা)

### সূচক


| ক্র. | পাঠের নাম | পৃষ্ঠ ক্র. |
|---|---|---|
| ১. | সংসদের শাসন পদ্ধতির পরিচয় .................... | ৬৮ |
| ২. | ভারতের সংসদ.................................... | ৭১ |
| ৩. | কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী মন্ডল (সংস্থা) ................ | ৭৫ |
| ৪. | ভারতের বিচার বিভাগ ............................ | ৭৯ |
| ৫. | রাজ্য সরকার...................................... | ৮৩ |
| ৫. | প্রশাসনিক সেবা .................................. | ৮৬ |

## অধ্যয়ন নিস্পত্তি

| নির্দেশিত শিক্ষাগত প্রক্রিয়া | অধ্যয়ন নিস্পত্তি |
| --- | --- |
| **ব্যক্তিগত/ শিক্ষার্থীদের জোড়া/ উপযুক্ত সমুহে অধ্যয়ন অনুভবের সুযোগ প্রদান করে নিম্ন কাজের জন) অনুপ্রানিত করবেন।**<br>• সংবিধান, সংপ্রদ, বিচার-বিভাগ, পার্শ্বীকরন বা (প্রান্তিক করন) (marginalization) এর মত সংকল্পনার উপর সহভাগী করে আলোচনা করা ।<br>• ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্ব, প্রস্তাবনা সংসদের শাসন পদ্ধতী, ক্ষমতার বিভাজন, সংঘরাজ্যের উপর অংকন ও ছবিসহ প্রাচীর চিত্র (ম্যুরান চিত্র) তৈরী এবং লিখিত/ মৌখিক রুপে প্রস্তুত করা।<br>• শ্রেনীতে / পাঠশলায় / ঘরে সমাজের স্বতন্ত্র, সমতা ও বন্ধুত্ব নীতিগুলি কীভাবে আচারন করা হয় এর উপর তর্ক-বিতর্ক করা।<br>• রাজ্যের / কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের লোকসভা কেন্দ্রগুলির মানচিত্র পর্যাবেক্ষন করা।<br>• শিশু সংসদের ও অভিরুপ আচরন সহিত অভিরুপ নির্বাচন আয়োজন করা।<br>• আমাদের পরিবেশে / পাড়ার নিবন্ধীত ভোটারদের তালিকা তৈরী করা।<br>• আমাদের পরিবেশে ভোটারদের গুরুত্ব সম্পর্কে সতেচনমূলক অভিযানের (প্রচারনার) আয়োজন করা।<br>• আমাদের নির্বাচনী অঞ্চলের জন প্রতিনিধীদের হাতে নেওয়া সার্বজনিক কাজসম্বন্ধে জেনে নেওয়া।<br>• প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন (FIR) বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা।<br>• দাবীদারদের ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য বিচারকদের ভুমিকা নিয়ে বিশদ ও চিকিৎসক লেখার মাধ্যমে স্বমতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া।<br>• বিশেষত: নারী বা মহিলা, অনুসুচিত জাতি ও অনুসুচিত উপজাতি, যাযাবর ও নি:স্বধর্মীয় ও ভাষাগত অল্পসংখ্যাক, অপঙ্গ, বিশেষ মৌলিক আবশ্যক বালক, এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত সমূহের মানব অধিকারের লঙঘন, সুরক্ষা ও প্রচার এর সম্বন্ধে দলগত আলোচনার আয়োজন করা।<br>• বালক শ্রমিক বাল অধিকার ও ভারতের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা পালন করা।<br>• সার্বজনিক সুবিধা ও জলের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সুবিধা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা বৈষম্য এর উপর সহযোগের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করার সুযোগ দেওয়া।<br>• সার্বজনিক সুবিধা সুযোগ প্রদানের দায়িত্ব শাসন কীভাবে করে, এর উপর তর্ক-বিতর্কের আয়োজন করা। | **ছাত্র-ছাত্রী**<br>08.73H.14 ভারতের সংবিধানের সন্দর্ভে (প্রক্ষাপটে) তাদের প্রদেশে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমাস্যার উপযুক্ত অর্থ করতে পারে।<br>08.73H.15 রাজ্যশাসন ও কেন্দ্রশাসন এর মধ্যে পার্থক্য বলতে পারে।<br>08.73H.16 লোকসভার নির্বাচন প্রক্রিয়ার বর্ণনা করে।<br>08.73H.17 রাজ্য / কেন্দ্রশাসন প্রদেশের লোক সভার নির্বাচনী এলাকার মানচিত্রে নিজের মতদার সংগুের স্থান নিশ্চিত করে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধীদের নাম লিখতে পারে।<br>08.73H.18 আইন প্রনয়নের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে (যেজন : গার্হস্থ্য হিংসার থেকে সংরক্ষন দেওয়া আইন, তথ্যের অধিকার আইন, শিক্ষার অধিকার আইন, ইত্যাদি)<br>08.73H.19 কিছু গুরুত্বপুর্ণ আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভারতের আদালতে ব্যবস্থার কার্য ব্যাখ্যা করে।<br>08.73H.20 ‘প্রথম তথ্য প্রতিবেদন’ (অহবাল) কীভাবে দাখিল করা হয়, তাহা প্রাত্যক্ষিক দেখাতে পারে।<br>08.73H.21 আমাদের প্রদেশের দুর্বল সমাজ বর্গের লোক আওতার বাইরে কেনো থাকতে হয় তার কারন এবং পরিনতির বিশ্লেষন করতে পারে।<br>08.73H.22 জল, সার্বজনিক স্বচ্ছতা, রাস্তা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। সার্বজনিক সুবিধা সরবরাহে করার জন্য শাসনের ভূমিকা জানে ও এই পরিসেবাগুলির প্রাপ্ততার দিকে আকৃষ্ট হয়।<br>08.73H.23 মহারাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের স্বরুপ ব্যাখ্যা করে। |

# ১. সংসদের শাসন পদ্ধতির পরিচয়

ভারতের সংবিধানে কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা বা শাসন পদ্ধতি দর্শানো হয়েছে। আমরা বর্তমান পাঠে এটি অধ্যয়ন করবো।

**তুমি কি এই প্রশ্নগুলিও অনুভব করেছো ?**

- সংসদের শাসন পদ্ধতি কাকে বলে ?
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী আছে কিন্তু আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী কেনো নেই।
- সংসদীয় শাসন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কি ?

উপরে উল্লেখিত কিছু প্রশ্ন থেকে আমাদের নজরে আসে প্রত্যেক দেশের শাসন পদ্ধতির স্বরূপ একে অন্যের থেকে আলাদা। বিভিন্ন প্রকারের শাসন পদ্ধতির স্বরূপ জানার আগে শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য সং গ্রহ করবো।

এই প্রতিষ্ঠানে আইনসভা আইন প্রনয়নের কাজ করে। কার্যনির্বাহী মন্ডল সরাসরি এই আইনের উপর কাজ করে। বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার কাজ করে। সংবিধান দ্বারা এই তিনটি অঙ্গের করার কাজ, তাদের অধিকার ক্ষেত্র এবং সীমা তথা তিনটি অঙ্গের পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারিত করা হয়। এই সম্বন্ধটা কোন স্বরূপের, তার উপরে শাসন প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ নির্ধারন করা হয়।

এর আধারে শাসন পদ্ধতির প্রধান দুই প্রকার দেখা যায়। (১) সংসদীয় শাসন পদ্ধতি (২) রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতি।

## সংসদীয় শাসন পদ্ধতি

সংসদীয় শাসন পদ্ধতি মূলত ইংল্যান্ডে বিকসিত (উন্নত) হয়েছে। ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত। আজও ওখানকার শাসনের অধিকাংশ কাজই পারম্পারিক সংকেতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। পার্লমেন্ট ও ওখানকার বিবর্ত্তন প্রতিষ্ঠান। পার্লামেন্ট ভিত্তিক পার্লামেন্টরী (Parliamentary) শাসন পদ্ধতিকে ইংল্যান্ডের অবদান বলে মনে করা হয়। ভারতে এই শাসন পদ্ধতিকে আমরা সংসদীয় শাসন পদ্ধতি রূপে স্বীকার করেছি। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের সংসদীয় শাসন পদ্ধতি এবং ভারতের সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে ব্যাপক রূপে সমতা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানমূলক উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে ভারতীয় শাসন পদ্ধতি আলাদা।

সংসদীয় শাসন পদ্ধতির নিম্ন বৈশিষ্ট্যগুলির তথ্য সংগ্রহ করবো।

- সংসদীয় শাসন পদ্ধতি শাসন চালানোর একটি পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় শাসন পদ্ধতির আইনসভাকে সাংসদ বলা হয়। ভারতে রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে সংসদ নির্মান হয়।
- লোকসভায় সংসদ প্রতিনিধিরা সরাসরি জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এই সদনে সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত থাকে।
- নির্ধারিত সময়সীমার পরে লোকসভার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহন করে। এই নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দল অর্ধেকের বেশি আসন পায়। ওই দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার তৈরি করে।
- অনেক সময় কোনো এক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না। এই স্থিতিতে কিছু রাজনৈতিক দল মিলে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমান করে। এবং তাহারা নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। একে জোট সরকার বলা হয়।
- এইভাবে জনগনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধি আইন সভার সদস্য হয়ে যায় এবং যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়, সে দল সরকার গঠন করতে পারে।
- যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়, ওই দলের

নেতা প্রধানমন্ত্রী হয়। এবং সে নিজের কিছু সহযোগিদের মন্ত্রী পদের জন্য নির্বাচন করে।

- প্রধানমন্ত্রী এবং তার দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রিসভা হলো সংসদীয় শাসন পদ্ধতির নিহিত কার্যনির্বাহী সংস্থা সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে কার্যনির্বাহী সংস্থার উপরে দায়িত্ব আছে। (১) কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসেবে আইনটি বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) সে আইন সভার সদস্য হয়। তাই তাদের আইনসভার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভা নিজেদের সব কাজ এবং নিতির জন্য পুনরায় আইনসভার প্রতি দায়িত্বশীল থাকে। এর অর্থ (মানে) এই মন্ত্রীসভাকে আইন সভার অধীনে থেকে শাসন চালাতে হয়। এই জন্য সংসদীয় শাসন পদ্ধতিকে দায়িত্বশীল শাসন পদ্ধতি বলা হয়। সামুহিক দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসন পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য আছে। যেকোনো বিভাগের সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সিদ্ধান্তের দায়িত্বশীলতা সম্পূর্ণ মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা হয়। সেটা প্রত্যক্ষ রূপে কিভাবে আনা হয়। এটা উদাহরন সহিত পরবর্তী পাঠে দেখবো।

সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে কার্যনির্বাহী সংস্থা আইনসভার বিশ্বাসের উপর স্থায়ী হয়। এর মানে এটা যতখন পর্যন্ত কার্যনির্বাহী সংস্থার আইন সভার সমর্থন থাকে তখন পর্যন্ত কার্যনির্বাহী সংস্থা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার মন্ত্রিসভা পদে থাকে। যদি আইনসভা এবং সংসদের এমন লাগে- কার্যনির্বাহী সংস্থা নিযম অনুসারে কাজ করছে না, তখন সংসদ অবিশ্বাস প্রস্তাব নিয়ে কার্যনির্বাহী সংস্থাকে ক্ষমতা থেকে বহিস্কার করে। অবিশ্বাস প্রস্তাব নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রভাবী সাধন।

সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে সংসদ এবং আইন সভাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসাদে সাধারন জনগনের প্রত্যাশাকে সামনে রাখে। জনগনের হিতেব জন্য কি করা দরকার। এটা সংসদ দ্বারা নির্ধারিত করা হয়। সংসদ জনগনের প্রতিনিধীদের সদন হওয়ার কারনে এবং জনগনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ব্যক্ত করার কারনে সংসদের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য এই শাসন পদ্ধতিকে সংসদীয় শাসন পদ্ধতি বলা হয়।

## সংসদীয় শাসন পদ্ধতিকে আমরা কেনো গ্রহণ (স্বীকার) করেছি ?

ভারত দেশ সংসদীয় শাসন পদ্ধতিকে গ্রহন করেছে। তার কিছু কারন আছে। ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের নির্মান হয়েছিলো। ব্রিটিশ এই পদ্ধতির মাধ্যমে শাসন চালানো শুরু করেছিলো। সংসদীয় শাসন পদ্ধতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অভিব্যক্তি। ফলস্বরূপ এই পদ্ধতির ভারতীয়দের পরিচয় হয়েছে। সংবিধান সভায় এই পদ্ধতির উপরে অনেক আলোচনা হয়েছিলো। সংবিধান কর্তারা এই পদ্ধতিতে ভারতীয় পরিস্থিতির অনুকুলে পরিবর্তন করেছে।

সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে চর্চা, পরিচর্চায় বড় অবসর থাকে। সংসাদে সার্বজনিক হিতের (স্বার্থের) প্রশ্নে চর্চা হয়। এই চর্চায় বিরোধী দলের সদস্যরা সহভাগ হয়। সঠিক মুদ্দায় সরকারের সহযোগ দেওয়া, সরকারের নিতি অথবা আইনের নিহিত দোষ দেখানো, প্রশ্নের অধ্যায়নপূর্ণ উপায়ে প্রস্তুত করা ইত্যাদি কাজ বিরোধী দল করতে পারে। এর মাধ্যমে সংসদের র্নিদোষ এবং সক্ষম আইন তৈরি করা সম্ভব হয়।

## রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতি

শাসন (সরকার) চালনোর একটি অন্য পদ্ধতি রূপে রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতির উল্লেখ করতে পারি। আমেরিকায় এমন শাসন প্রনালী। এই পদ্ধতি সংসদের শাসন পদ্ধতি থেকে আলাদা। আইন নিয়ম অনুসারে কাজ করছে না, তখন সংসদ অবিশ্বাস প্রস্তাব নিয়ে কার্যনির্বাহী সংস্থাকে ক্ষমতা থেকে বহিস্কার করে। অবিশ্বাস প্রস্তাব নিয়ন্ত্রন রাখার প্রভাবী সাধন সভায় কার্যনির্বাহী সংস্থা আগ্রহহীন থাকে এবং যেখানে

কার্যনির্বাহী প্রধান (রাষ্ট্রপ্রধান) জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এই পদ্ধতিকে রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতি বলে। শাসন প্রতিষ্ঠানের তিনটি অঙ্গ এই পদ্ধতি থেকে একে অন্যে আলাদা হয়। কিন্তু তাদের কাজে একসুত্রতা থাকে। এর জন্য দরকারী পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকে। আমেরিকা এই শাসন পদ্ধতিকে স্বীকার (গ্রহন) করেছে। এই শাসন পদ্ধতির নিম্ন কিছু বৈশিষ্ট্য।

- রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতিতে আইনসভা। এবং কার্যনির্বাহী সংস্থা একে-অন্যের উপর নির্ভর থাকে না। আইন সভার এক সদনের নির্বাচন জনগনের মাধ্যমে হয় অন্যদিকে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন ও সোজা জনগনের মাধ্যমে করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধান কার্যনির্বাহী প্রধান হয়। আইন বাস্তবায়নের সাথে-সাথে অন্য অধিকার ও থাকে।
- রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতিতে এই রকম গঠন হওয়ার পরে ও আইন সভা এবং কার্যনির্বাহী সংস্থা একে-অন্যের নিয়ন্ত্রণ রাখে। একে অন্যের নিয়ন্ত্রন রাখার উত্তরদায়িত্ব পদ্ধতিতে শাসন চালানো যায়।

সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু শাসন পদ্ধতি ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী ইত্যাদি দেশে আছে। বিভিন্ন দেশ নিজেদের পরিস্থিতি অনুকুল এরকম শাসন পদ্ধতির নির্ভর থাকতে দেখা যায়।

পরবর্তী পাঠে, আমরা সংসদের রচনা কার্যপদ্ধতি এবং ভূমিকা ইত্যাদির অধ্যায়ন করবো।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পুনরায় লেখো।**

(১) সংসদীয় শাসন পদ্ধতি ............ উন্নত (বিকসিত) হয়েছে।

(অ) ইংল্যান্ড (ব) ফ্রান্স
(ক) আমেরিকা (ড) নেপাল

(২) রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতিতে ............ কার্যনির্বাহী প্রধান হয়।

(অ) প্রধানমন্ত্রী (ব) লোকসভা প্রধান
(ক) রাষ্ট্রপ্রধান (ড) রাজ্যপাল

**২. নিম্ন তালিকা পূর্ণ করো।**

| অ. ক্র. | সংস্থার নাম | কার্য / কাজ |
|---|---|---|
| ১. | আইন সভা | |
| ২. | কার্যনির্বাহী সংস্থা | |
| ৩. | বিচার বিভাগ | |

**৩. নিম্ন বাক্য কারন সহিত স্পষ্ট করো।**

(১) ভারত দেশ সংসদীয় শাসন পদ্ধতি স্বীকার (গ্রহন) করেছে।

(২) সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে চর্চা এবং পরিচর্চার অনেক (বড় মহত্ব) গুরুত্ব থাকে।

**৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ২৫ থেকে ৩০ শব্দে লেখো।**

(১) উত্তরদায়ী শাসন পদ্ধতি কাহাকে বলে?

(২) রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট করো।

**৫. বিরোধী দলের ভূমিকা মহত্বপূর্ণ কেনো? এই বিষয়ে নিজের বিচার লেখো।**

**উপক্রম**

দুরদর্শনের রাষ্ট্রীয় চ্যানেলে লোকসভা এবং রাজ্যসভার চলমান সোজা প্রসারন দেখে নিরীক্ষন করো।

# ২. ভারতের সংসদ

সংসদ ভবন, নই দিল্লী

সংসদের উভয় কক্ষকে যথাক্রমে লোকসভা ও রাজ্যসভা বলা হয়।

**লোকসভা :** ভারতীয় সংসদের ছোট এবং প্রথম কক্ষকে লোকসভা বলা হয়। লোকসভা সংসদের ওই কক্ষ যেখানে প্রতিনিধিরা জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আসে। এইজন্য লোকসভাকে প্রথম কক্ষ (সদন) বলা হয়। লোকসভায় ভৌগলিক নির্বাচন ক্ষেত্র পদ্ধতিতে প্রার্থীদের নির্বাচিত করে পাঠানো হয়। লোকসভার কার্যকাল (সময়সীমা) পাঁচ বৎসরের হয়। লোকসভা নির্বাচন প্রত্যেক পাঁচ, বছরে হয়। এসব নির্বাচনকে সার্বজনীক নির্বাচন বলা হয়। কখন-কখন পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই লোকসভা ভেঙে দেওয়ার উদাহরন আছে। এই সময় হওয়া নির্বাচনকে মধ্য মেয়াদী নির্বাচন বলে।

আমরা দেখেছি সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তুত পাঠে ভারতের সংবিধানের অধ্যয়ন করবো। ভারতের সংবিধানের নির্মান সংবিধানের মাধ্যমে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্তরে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসন পদ্ধতির আইনসভাকে সংসদ বলা হয়। তার অনুসারে সংসাদে রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভার সমবেশ হয়। রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংসাদের অবিভাজ্য ঘটক কিন্তু তিনি সদনে উপস্থিত থেকে চর্চায় সহভাগ হতে পারে না।

লোকসভা দেশের লোকের প্রতিনিধিত্ব করা কক্ষ (সদন)। সংবিধান অনুসারে লোকসভার অধিকতম সদস্য সংখ্যা ৫৫২ হয়। আমাদের দেশের সব সমাজ ঘটকেরা প্রতিনিধিত্ব পায়। এইজন্য তফসিলী জাতি, ও উপজাতির জন্য আরক্ষন (রিজার্ভেশন) দেওয়া হয়েছে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের উচিৎ প্রতিনিধিত্ব না পাওয়া গেলে রাষ্ট্রপতি এই সমাজের দুই প্রতিনিধীকে লোকসভার জন্য মনোনয়ন করতে পারে।

**খোঁজো ?**

ঘটক (কেন্দ্রশাসিত) রাজ্যের তার জনসংখ্যা অনুপাতে লোকসভায় আসন পায়। নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যের ভৌগলিক নির্বাচন ক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়েছে। নির্বাচন ক্ষেত্রের জন সংখ্যা সাধারনত সমান থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের লোকসভার কয়টি আসন থাকে। তাহা অন্তরজাল (ইন্টারনেটের) মাধ্যমে খোজো। উদা.

মহারাষ্ট্র - ৪৮ আসন
গুজরাট -
মধ্যপ্রদেশ -
উত্তরপ্রদেশ -
গোয়া -

**রাজ্যসভা :** রাজ্যসভাকে ভারতীয় সংসদের বরিষ্ঠ (বড়ো) দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয়। রাজ্য সভা ভারতীয় সংসদের ওই কক্ষ, যেখানে প্রার্থী অপ্রতক্ষ্য রূপে নির্বাচিত হয়ে আসে রাজ্যসভা ভারতীয় কেন্দ্র রাজ্যের ২৮টি ঘটক রাজ্য

### করে দেখো।

**মেরী** : আমি মেট্রিক পরীক্ষা পাস হওয়ার পরে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি।

**রাধিকা** : না! যখন তুমি ১৮ বছরের হবে, তখন তুমি ভোট করতে পারবে কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

**রনবীর** : আরে, তুমি জানো না লোকসভার নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বয়স ২৫ বছর পূর্ন হওয়া দরকার।

**শাবানা** : যদি নিজেদের প্রতিবেশি দেশের ব্যক্তি লোকসভা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করতে চায় তাহলে?

**মুস্কান** : এটা কি করে সম্ভব ? ওই ব্যক্তি ভারতের নাগরিক কি?

**প্রনব** : মনে করো, আমাকে কেরল থেকে নির্বাচন লড়তে হবে, এটা কি সম্ভব।

**রাধিকা** : হ্যাঁ, আমাদের শিক্ষক মহোদয় বলেছিলো, লোকসভার জন্য আমরা যে কোনো রাজ্যের নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি।

**মৃনাল** : আয়ু এবং নাগরিকত্ব সম্বন্ধিত শর্তের জানকারী (তথ্য) পাওয়া। কিন্তু নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কাহাকে অযোগ্য মানা উচিৎ।

**মেরী** : যোগ্যতার যতন অযোগ্যতার কিছু শর্ত থাকে। চলো নিজেদের শিক্ষকের কাছ থেকে তথ্য (জানকারী) নেবো।

এবং ৯ কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। এর মানে এই রাজ্যসভার ঘটক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব সদস্য রূপে কাজ করে।

রাজ্যসভাব কুল (মোট) সদস্য সংখ্যা ২৫০। এরমধ্যে ২৩৮ সদস্য বিভিন্ন ঘটক রাজ্যে এবং কেন্দ্র শাসিত প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়ে আসে। রাজ্যসভায় প্রত্যেক ঘটক রাজ্যের সদস্য (প্রার্থী) সংখ্যা এক সমান হয় না। জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব থাকে। এবং ১২ সদস্যকে (প্রার্থী) রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, ক্রীড়া ইত্যাদিপ্রত্যক্ষ অনুভাবী ব্যক্তি অথবা তাহার বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে কিছু লোকের রাজ্যসভায় মনোনীত করা হয়। রাজ্যসভায় সদস্যদের নির্বাচন অনুপাতবদ্ধ প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে হয়।

রাজ্যসভা কখনই সম্মিলিত ভাবে ভেঙে দেওয়া হয় না। এই জন্য একে স্থায়ী কক্ষ (সদন) মনে করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেক দুই বছর পরে রাজ্যসভার ৬ বছরের কার্যকাল (সময়সীমা পূর্ণ করা ১/৩ প্রার্থী (সদস্য) অবসর নেয়। এবং আবার সেই সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হয়। চরনবদ্ধ এবং নিশ্চিত সদস্য সংখ্যা অবসর হওয়াতে রাজ্যসভা ক্রমাগত কাজ করতে থাকে। রাজ্যসভার নির্বাচন লড়া প্রতিনিধি ভারতীয় নাগরিক হওয়া দরকার। তার বয়স ৩০ বছর পূর্ণ হওয়া দরকার।

লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যাকে সাংসদ বলা হয়। সাংসদ নিজেদের নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রশ্ন সংসদের উপস্থিত করে তার সমাবান করার চেষ্টা করে নির্বাচন ক্ষেত্রের বিকাস কাজের জন্য ওনাদের বিকাস রাশি দেওয়া হয়।

**সংসদের কাজ :** ভারতীয় সংসদের লোক সভা এবং রাজ্যসভা কক্ষের তথ্য সংগ্রহ করার পরে আমরা তাদের কাজের পর্যবেক্ষন করবো।

**আইন নির্মান (প্রনয়ন) :** লোকেদের হিত এবং কল্যানের জন্য সংবিধানে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে প্রত্যক্ষ রূপে নিয়ে আসার জন্য অনেক নতুন আইন নির্মান (তৈরি) করা লাগে। সাথে-সাথে পুরানো আইন খারিজ করতে হয়। কিছু আইনে উচিৎ পরিবর্তন করতে হয়। সংবিধানে আইন তৈরির প্রক্রিয়া স্পষ্ট করা হয়েছে। তার অনুসারে সংসদ নিজের প্রাথমিক অথবা প্রধান দায়িত্ব পালন করে।

### বলো দেখি?

যে আইন পুরানো হয়েছে, এইজন্য এটা খারিজ করা হয়েছে। তুমিকি এমন আইনের উদাহরন দিতে পারো? উদা- রাজকীয় বেতন।

**মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ :** সংসদদ্বারা প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রি সভার নির্মান হয়। সংসদের তারউপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে। নিয়ন্ত্রণ রাখতে বিভিন্ন-বিকল্পগুলি তার কাছে উপলব্ধ থাকে। সংসদের উপেক্ষিত করে মন্ত্রিসভা কাজ করবে না। এটা দেখার দায়িত্ব সংসদের থাকে।

**সংবিধান সংশোধন :** ভারতীয় সংবিধানে কিছু করতে হলে, সংসদ ওই সন্ধর্ভে নির্ণয় নেয়। সংবিধানে সংশোধন করার প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ন। সংসদ তার প্রয়োজনে চর্চা করে প্রস্তাবটাকে স্বীকার অথবা অস্বীকার করবে তার নির্ণয় নেয়। ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের কিছু নিম্ন পদ্ধতি- (১) ভারতীয় সংবিধানের কিছু বিধান সংসদের সামান্য - সংখ্যাগরিষ্ঠ দিয়ে পরিবর্তন করা হয়। (২) কিছু বিধানেব জন্য (২/৩) সংখ্যাগরিষ্ঠর দরকার হয়। (৩) কিছু বিধান বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা অর্ধেক ঘটক রাজ্যের স্বীকৃতি দিয়ে পরিবর্তন করা হয়।

**লোকসভার স্পিকার :** (অধ্যক্ষ) লোকসভার নির্বাচনের পরে প্রথম সভায় লোকসভার সদস্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্তি করে তথা অন্য এক সদস্যকে উপঅধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত (নিয়োগ) করে। লোকসভার অধ্যক্ষের মার্গদর্শনে এবং নিয়ন্ত্রনে লোকসভার কার্যবাহী (কাজ) হয়। লোকসভা ভারতীয় জনতার এবং অধ্যক্ষ লোকসভার প্রতিনিধিত্ব করে। অধ্যক্ষের পদে চয়ন (নির্বাচন) হওয়ার পরে অধ্যক্ষকে নিরপেক্ষ রূপে সদনের (কক্ষের) কাজকাম চালানো লাগে লোকসভার সদস্যদের লোকপ্রতিনিধি রূপে কিছু অধিকার এবং বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত থাকে। অধ্যক্ষ দ্বারা তার রক্ষা করা হয়। অধ্যক্ষ (স্পীকার) সংসদের কাজ কাম ঠিকভাবে চালানো, সংসদের গরিমা (মর্যদা) রক্ষা করা। কাজকাম বিষয় নিয়মের অর্থ স্পষ্ট করে সেটা চালানো ইত্যাদি কাজ করা লাগে।

**এই তথ্যও জেনে রাখো !**

লোকসভা এবং রাজ্যসভা এই দুই কক্ষের (সদনের) অধিকার সমান। কিন্তু কিছু অধিকার এমন ওআছে। যেটা লোক সভার আছে কিন্তু রাজ্যসভার নেই। উদা- খাজনা বিষয় অধিকার টাকার সম্বন্ধিত থাকে। তাহার সম্বন্ধিত প্রস্তাব 'বিত্তীয়' মানা হয়। আর এ ধরনের সব প্রস্তবে কেবলমাত্র লোকসভায় প্রস্তুত করা হয়। আর সেখানে তার মঞ্জুরী দেওয়া হয়। রাজ্যসভার এই সন্ধর্ভে অনেক কম অধিকার আছে। কিছু অধিকার রাজ্যসভারও আছে কিন্তু লোকসভার নেই। উদা- রাজ্যসূচীতে নিহিত কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রহিতের দৃষ্টিতে সংসদ দ্বারা কোনো আইন তৈরি করার অনুভব হলে রাজ্যসভায় প্রস্তাব পারিত করা হয়।

**রাজ্যসভার অধ্যক্ষ (স্পীকার) :** রাজ্যসভার পূর্ন কাজ অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রনে চলে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার অধ্যক্ষ হয়। রাজ্যসভার অধ্যক্ষের অনুশাসন তৈরি করে রাখা, চর্চার আয়োজন করা, সদস্যদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি কাজ করা লাগে।

## সংসদে আইন কিভাবে তৈরি হয় ?

আমাদের দেশে সংসদকে আইন তৈরি করার অধিকার দেওয়া হয়েছে আইন তৈরি করার জন্য বিশেষ পদ্ধতির স্বীকার করা হয়েছে। ওই পদ্ধতিকে আইন নির্মান প্রক্রিয়া বলা হয়। প্রথমে আইনের মোটামুটি খসড়া তৈরি করা হয়। এই খসড়া কে অথবা প্রারূপকে 'আইন প্রস্তাব' অথবা 'বিল' বলে।

সংসদের সদনে প্রস্তুত করা বিল দুই প্রকারের থাকে। (১) অর্থবিল (২) সাধারন বিল।

বিলকে আইনে পরিবর্তন করার নিম্ন প্রক্রিয়া।

**প্রথম পঠন :** সম্বন্ধিত বিভাগের মন্ত্রী অথবা সংসদ সদস্য বিল প্রস্তুত করে। বিল প্রস্তুত করার সময় তার স্বরূপ সংক্ষেপে স্পষ্ট করতে হয়। একে বিলের প্রথম পঠন বলে।

**দ্বিতীয় পঠন :** দ্বিতীয় পঠন দুই চরনে হয়। প্রথম চরনে বিলের উদ্দেশ্যের চর্চা করা হয়। সদনের সদস্য বিলের বিষয়ে নিজের - মতামত প্রকাশ করে। বিলের সমর্থক বিলের সমর্থন করে নিজের মতামত প্রকাশ করে। তার বিরোধিতা কারীরা বিলের যে অপূর্ণতা এবং দোষ আছে তাহা স্পষ্ট করে। সদনে (কক্ষে) বিলের চর্চা হওয়ার পরে প্রয়োজন মনে হলে বিল এক সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সমিতি সেই বিলকে নির্দোষ বানানোর (তৈরির) জন্য সুচনা এবং সংশোধনের প্রতিবেদন সদনে পাঠিয়ে দেয়। তার পরে দ্বিতীয় পঠনের দ্বিতীয় (পর্বের) চরন শুরু হয়। এই চরনে (পর্বে) বিলের ধারার উপরে চর্চা হয়। সদস্যরা কিছু সংশোধনের নির্ণয় করতে পারে। তারপরে সদনে ভোটগ্রহন নেওয়া হয়।

**তৃতীয় পঠন :** তৃতীয় পঠনের সময় বিলের উপর সংক্ষেপে চর্চা করা হয়। বিলের অনুমোদন প্রস্তাবে ভোটগ্রহন করা হয়। বিলের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুমোদন পাওয়ার পরে সদন দ্বারাবিল পারিত (উত্তীর্ণ) হয়। এমনটা মানা হয়।

- সংসদের দ্বিতীয় কক্ষে (সদনে)ও বিধায়ক সমস্ত উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে যায়। দুই কক্ষের দ্বারা বিলের অনুমোদন পাওয়ার পরে তাকে অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয়।
- কেন্দ্রে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বিল নিয়ে মতভেদ (পার্থক্য) হলে দুই কক্ষের সংযুক্ত অধিবেশনে তার ভবিষ্যত নিশ্চিত করা হয়।

রাষ্ট্রপতির সম্মতিদর্শক স্বাক্ষর হওয়ার পরে বিল আইনে পরিবর্তন হয় এবং আইন তৈরি হয়।

**এই সম্পর্কেও তথ্য নাও।**

- প্রত্যেক বছর ফ্রেরুয়ারী মাসে অর্থমন্ত্রী লোকসভায় দেশের বাজেট পেশ করে।
- রাজ্যের আইন সভায় আইন তৈরি করার সময় সংসদের মত পদ্ধতি স্বীকার করা হয়। রাজ্য আইন সভার মাধ্যমে অনুমোদন পাওয়ার পরে বিলে রাজ্যপালের সম্মতিদর্শক স্বাক্ষর হওয়ার পরে বিল আইনে পরিবর্তন হয়।

## অনুশীলনী

**১. নিম্ন বিকল্পগুলি থেকে উপযুক্ত বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পুনরায় লেখো।**

(১) লোকসভায় ............. পদ্ধতিতে প্রার্থীদের নির্বাচন করে পাঠানো হয়।
(অ) ভৌগলিক নির্বাচন ক্ষেত্র
(ব) ধার্মিক নির্বাচন ক্ষেত্র
(ক) স্থানীয় স্বাশাসন নির্বাচন ক্ষেত্র
(ড) অনুপাতবদ্ধ প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি

(২) ভারতের ............. রাজ্যসভায় পদাধিকারবলে অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান) হয়।
(অ) রাষ্ট্রপতি (ব) উপরাষ্ট্রপতি
(ক) প্রধানমন্ত্রী (ড) প্রধানবিচারপতি

**২. খোঁজো এবং লেখো।**

(১) লোকসভা এবং রাজ্যসভা সদস্যকে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়-----------।
(২) লোকসভাকে প্রথম কক্ষ (সদন) বলা হয় -----------।
(৩) আইন(কানুন) নির্মানের দায়িত্ব তার আছে---।

**৩. নিম্ন বাক্য কারন সহিত স্পষ্ট করো।**

(১) রাজ্য সভা স্থায়ী সদন (কক্ষ)।
(২) লোকসভাকে প্রথম কক্ষ (সদন) বলা হয়।

**৪. নিম্ন প্রশ্নের উত্তর ২৫ থেকে ৩০ শব্দে লেখো।**

(১) লোকসভা প্রাথীদের নির্বাচন কিভাবে করা হয় ?
(২) লোকসভা অধ্যক্ষের কার্য স্পষ্ট করো।

**৫. আইন নির্মান প্রক্রিয়ার চরন (পর্ব) স্পষ্ট করো।**

**উপক্রম**

রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার ১২ সদস্য মনোনীত করে। এই সদস্য (প্রার্থীদের) নির্বাচন করারজন্য কি-কি-মানদন্ড অনুসরন করা হয়। তার তথ্য সংগ্রহ করো।

# ৩. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী মন্ডল (সংস্থা)

পুর্ববর্তী পাঠে আমরা কেন্দ্রীয় স্তরে আইনসভা অর্থাৎ সংসদের রচনা এবং কাজের পদ্ধতির অধ্যয়ন করেছি। উপস্থাপিত পাঠে আমরা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী মন্ডলের (সংস্থার) অধ্যয়ন করবো।

**কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো (সংরচনা) :** সংঘ শাসন অর্থাৎ কেন্দ্র শাসন। কেন্দ্র শাসনের নিম্ন প্রধান ঘটক।

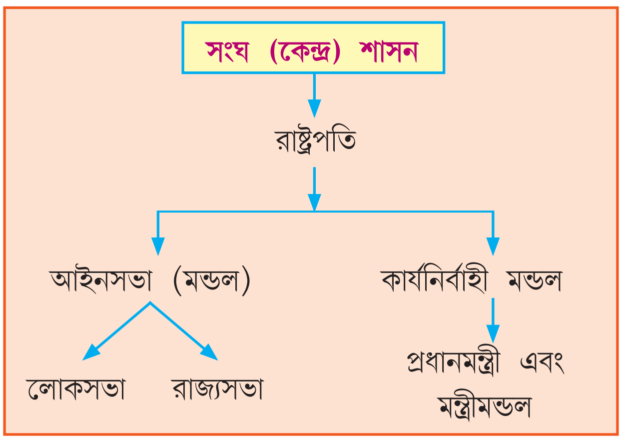


আইনসভা (মন্ডল), কার্যনির্বাহী মন্ডল, (সংস্থা) এবং বিচার বিভাগ (মন্ডল) এটা শাসন সংস্থার তিনটি শাখা এবং জনগনের হিতের কথা মাথায় রেখে জনগনের কল্যানের কাজ করে। এটা আমরা জানি। সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে কার্যনির্বাহী মন্ডল (সংস্থা) আইন সভার (মন্ডল) অঙ্গ। এবং সেটা আইন সভার জন্য দায়ী হয়।

**রমা :** রাষ্ট্রপতি হলেন সাংবিধানিক প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন কার্যনির্বাহী প্রধান। দুই পদে কাজ করা ব্যক্তির কিরকম সম্পর্ক থাকে।

**বিদ্যা :** আমার এমনটা লাগে প্রধানমন্ত্রী নিয়মিত রূপে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করে এবং সে শাসন কিভাবে চালায় তার জানকারী (তথ্য) দেয়।

হ্যাঁ ! এটাই সত্য। প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসন এবং নতুন-নতুন আইন, নিতির তথ্য (জানকারী) রাষ্ট্রপতিকে দেয়। অর্থাৎ এই তথ্য (জানকারী) সংগ্রহ করার অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে।

এই কার্যনির্বাহী মন্ডলে (সংস্থায়) কার সমাবেশ থাকে। সংবিধানে এ বিষয়ে কি বিধান আছে। কার্যনির্বাহী মন্ডল (সংস্থা) জনগনের হিতের জন্য কি ধরনের নীতি তৈরি করে। অনান্য বিষয়ে আমাদের কার্যনির্বাহী মন্ডলের অধ্যয়ন করার সময় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী মন্ডলে (সংস্থায়) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার মন্ডলের সমবেশ হয়।

**রাষ্ট্রপতি :** ভারতের সংবিধানে নিহিত বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রমুখ (প্রধান)। রাষ্ট্রপতির পদ অনেক বড় সম্মান এবং প্রতিষ্ঠার পদ এবং সে প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে দেশের পূর্ন নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দেশের শাসন রাষ্ট্রপতির নামে চলে। এটা হওয়ার সত্তেও প্রত্যক্ষ রূপে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রীমন্ডল শাসন চালায়। এই জন্য রাষ্ট্রপতি মনোনীত সংবিধানিক প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী কাযনির্বাহী প্রধান।

**রাষ্ট্রপতির নির্বাচন :** রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরোক্ষ রূপে জনগনের মাধ্যমে করা হয়। ভারতের সাধারন ভোটাররা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করে না বরং জনগনের দ্বারা নির্বাচিত সংসদ প্রার্থী (সদস্য) এবং রাজ্যের বিধান সভার সদস্য দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করা হয়। সংসদ সদস্য এবং রাজ্য বিধান সভার সদস্যের দলকে নির্বাচন মন্ডল বলা হয়।

রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছরের থাকে। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন প্রতিনিধিত্ব করা ব্যক্তি ভারতের নাগরিক হওয়া দরকারা তার বয়স ৩৫ বছর পূর্ণ হওয়া চাই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিজের পদ স্বীকার করার সময় শপথ নেওয়া লাগে। তাহার অনুসারে সংবিধাননে রক্ষা করা

এবং সংবিধান অনুসারে শাসন চালায় কি না এটা দেখার - অধিকার রাষ্ট্রপতির থাকে। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিমন্ডলের উপদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন চালায়। সংবিধান রক্ষা করার অধিকার রাষ্ট্রপতির থাকে কিন্তু রাষ্ট্রপতির কোনো আচরন সংবিধান লঙ্ঘন করলে তাকে পদ থেকে অপসারনের অধিকার সংসদের রয়েছে। এই প্রক্রিয়া কে 'অভিশংসন' প্রক্রিয়া বলা হয়। যদি রাষ্ট্রপতির দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘন হয় কোনো সদন দ্বারা অভিযোগ করা হয় এবং দ্বিতীয় সদন দ্বারা ঐ অভিযোগের তদন্ত করা হয়। দুই কক্ষের (সদনের) বিশেষ সংখ্যা গরষ্ঠ (২/৩) এ প্রস্তাব পাস হওয়া দরকার। তারপরে রাষ্ট্রপতি নিজের পদ থেকে দুর সরে হয়।

রাষ্ট্রপতির কাজ এবং অধিকার : সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্রপতির অনেক কাজ প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কাজ এই রকম :

(১) রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা। স্থগিত করা। সংসদে বার্তা পাঠানো, লোকসভার পূর্নসময় পরে অথবা সময়ের প্রথমে বরখস্ত করার অধিকার প্রাপ্ত আছে।

(২) লোকসভা এবং রাজ্যসভা দ্বারা পাস করা বিলের উপর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হওয়া দরকার। ওনার স্বাক্ষর ছাড়া বিল আইনে পরিবর্তন হয় না।

(৩) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ করে এবং তার দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে (নিযুক্তি) নিয়োগ করে।

(৪) রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম ও হাই কোর্টের বিচার পতিদের নিয়োগ দেয়। সাথে-সাথে সব রাজ্যেপাল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদের ব্যক্তিদের নিয়োগ করে। রাষ্ট্রপতির ও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে মানবিক ভূমিকা থেকে সাজা কমানো বা বাতিল করার, দ্রুত বা ব্যতি ক্রমী পরিস্থিতিতে কাজ করার অধিকার রয়েছে।

(৫) রাষ্ট্রপতি ভারতের তিনটি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ প্রধান হয়। যুদ্ধ এবং শান্তি সম্বন্ধের সব নির্ণয় রাষ্ট্রপতি নেয়।

(৬) রাষ্ট্রপতির কিছু আদালতের অধিকার ও থাকে উদা- কোনো ব্যক্তির শাস্তি কম করা, অথবা শাস্তি খারিজ করার অধিকার ও আছে।

(৭) দেশে জরুরী অবস্থা উৎপন্ন হলে রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা ঘোষনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে তিন ধরনের জরুরি অবস্থা দেওয়া হয়েছে। (১) রাষ্ট্রীয় জরুরি (২) রাজ্যে জরুরি অথবা রাষ্ট্রপতি শাসন (৩) আর্থিক জরুরি অবস্থা।

রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি তাহার দায়িত্ব পালন করে। উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংসদের দুই কক্ষের (সদনের) দ্বারা হয়।

**করে দেখো।**

রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া শপথের খসড়া প্রপ্তি (সংগ্রহ) করো। শিক্ষকের সাহায্যে তার অর্থ বুঝে নেও।

**প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রী মন্ডল :** রাষ্ট্রপতি সংবিধানিক প্রধান হয়। তার কাছে নামমাত্র ক্ষমতা থাকে। এবং প্রত্যক্ষ রূপে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিমন্ডল শাসন চালায়। এটা আমরা সবাই জানি। প্রধানমন্ত্রী কি কাজ এবং ভূমিকার পালন করে সেটা আমরা দেখবো।

নির্বাচনে যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। সেই দল নিজের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নির্বাচিত করে। এই দলের বিশ্বাসপাত্র সহযোগিকে প্রধানমন্ত্রী নিজের মন্ত্রীমন্ডলে (সভায়) অন্তর্ভূক্ত করে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রির সংসদ সদস্য হওয়া দরকার। নাহলে ছয় মাসের ভিতরে সংসদ সদস্য হওয়া প্রয়োজনা প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রীমন্ডল প্রকৃত অর্থে শাসন চালায়। এর বাস্তবিক অর্থ শাসনের (বাস্তবিক) আসল সত্তা প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রীমন্ডলের কাছে থাকে।

## প্রধানমন্ত্রীর কাজ

(১) প্রধানমন্ত্রী সর্ব প্রথম নিজের মন্ত্রীমন্ডল গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের বিশ্বাসপাত্র (বিশ্বাসনীয়) সহযোগিকে প্রাথমিকতা (প্রাধান্য) দেয় কিন্তু তার সাথে-সাথে-মন্ত্রিদের চয়ন করার সময়তার প্রশাসকীয় অনুভব, শাসন কৌশাল্য কার্যক্ষমতা, বিষয়জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করে।

(২) মন্ত্রিমন্ডলে কাহাদের সমবেশ (শামিল) করতে হবে। এটা নিশ্চিত করার পরে প্রধানমন্ত্রী তাহাদের বিভাগের বিতরন করে।

(৩) প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমন্ডলের নেতৃত্ব করে। মন্ত্রিমন্ডলের সব সভা তার অধ্যক্ষতায় হয়।

(৪) বিভাগের বিতরনের পরে-প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় রাখা, পরস্পর সাহায্যকে বৃদ্ধি করা। বিভাগের কাজ পূর্ন কার্যক্ষমতায় হয় অথবা হয় না এটা দেখা ইত্যাদি কাজপূর্ন করা লাগে।

(৫) অন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দেশের ছবি ভালো রাখা, বিশ্বের মতামত নিজের অনুকুলে রাখার চেষ্টা করা। দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করা। বিপর্যয়ের সময় বিপর্যয় গ্রস্থদের সাহায্য করা ইত্যাদি কাজের প্রধানমন্ত্রীকে টিকে থাকতে হয়।

### তুমি জানো কি ?

তুমি কি জাম্বো ক্যাবিনেট (মন্ত্রিমন্ডল) শব্দটি শুনেছো ?

এর অর্থ - অনেক বড়ো মন্ত্রীমন্ডল। আমাদের দেশের মন্ত্রীমন্ডলের আকার বড় রাখার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। সংবিধানে মন্ত্রিসভার স্থান সীমিত রাখার বিধান করা হয়েছে। তার অনুসারে মন্ত্রিমন্ডলের সংখ্যা লোকসভার মোট সদস্য করে তার উপরে চর্চা করা হয়। এবং তার পরে সংসদের সদনে (কক্ষে) প্রস্তুত করা হয়। মন্ত্রিমন্ডল সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের চর্চা করে নির্ণয় নেয়। সংখ্যার ১৫% থেকে বেশি হবে না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

## মন্ত্রীমন্ডলের কাজ

(১) সংদীয় শাসন পদ্ধতিতে মন্ত্রিমন্ডল আইন তৈরিতে অগ্রসর থাকে। ঢাচা করে তার উপরে চর্চা করা হয়। এবং তার পরে সংসদের সদনে (কক্ষে) প্রস্তুত করা হয়। মন্ত্রিমন্ডল সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের চর্চা করে নির্ণয় নেয়।

(২) শিক্ষা, কৃষি, উদ্যেগ, স্বাস্থ্য, বৈদেশিক আচরন ইত্যাদির মতো অনেক বিষয়ে মন্ত্রীসভাকে একটি নির্দিষ্ট নীতি বা পদক্ষেপ নির্ধারিত করতে হয়। মন্ত্রিসভার দ্বারা নির্ধারিত নীতির সম্বন্ধে সংসদের বিশ্বাস নেওয়া লাগে। এই জন্য মন্ত্রীমন্ডলের মন্ত্রী নিজের বিভাগের নীতি সংসদে উপস্থিত করে সংসদের অনুমোদন পাওয়ায় চেষ্টা করে।

(৩) নীতিমালা বাস্তবায়নই মন্ত্রিসভার প্রধান দায়িত্ব। সংসদ দ্বারা ঐ নীতিগুলিকে আইন প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়ার পরে মন্ত্রিসভা সেটাকে প্রয়োগ (বাস্তবায়ন) করে।

## সংসদ মন্ত্রিসভাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে ?

সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে সংসদের মন্ত্রিসভার উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা থাকে। আইন অথবা নীতির নির্মান, সেটাকে বাস্তবায়নে আনা এবং তারপরে সংসদ মন্ত্রিসভার উপরে নিয়ন্ত্রন রাখে। এই নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায় এই রকম।

**(১) চর্চা এবং বিচার বিমর্শ :** আইন তৈরি করার সময় সংসদ সদস্য চর্চা এবং বিচার বিমর্শ করে মন্ত্রিসভাকে তার নীতি এবং আইনের অন্তর্নিহিত ঘাটতি দেখায়। নির্দোষ আইন তৈরি করার দৃষ্টিতে এই চর্চাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

**(২) প্রশ্নকাল (ঘন্টা) :** সংসদে অধিবেশনের সময় সদনের কার্যবাহী শুরু থাকা কালিন সংসদে সদস্য দ্বারা প্রশ্ন শোনা হয়। এই প্রশ্নের সম্বন্ধিত মন্ত্রীর দ্বারা সন্তোষজনক উত্তর প্রয়োজন। প্রশ্ন কাল মন্ত্রিসভার উপরে নিয়ন্ত্রন রাখার একটি অনেক বড় প্রভাবী উপায়। শাসনের আলোচনা

করা, প্রশ্ন উপস্থিত করা এটা এই সময়ে হয়। মন্ত্রিদের উত্তর সন্তুষ্ট না হলে বিবাদ উৎপন্ন হতে পারে। নিজের নিষেধ ব্যক্ত করার জন্য কিছু সময়ের জন্য সংসদ সদস্য সভাত্যাগ করে অথবা ঘোষনা দিয়ে কক্ষের (সদনের) মধ্যস্থানে একত্রিত হয়।

**(৩) শূন্যকাল :** অধিবেশন সত্রের সময় দুপুর ১২ টার সময় শূন্যকাল রূপে জানা যায়। এই সময়ে সার্বজনিক দৃষ্টিতে মহত্বপূর্ন। যে কোনো বিষয়ের উপরে চর্চা করানো হয়।

**(৪) অবিশ্বাস প্রস্তাব :** মন্ত্রিসভার উপরে নিয়ন্ত্রণ রখার এটা একটা প্রভাবী উপয়। লোকসভায় সরকারের যতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে ততক্ষন পর্যন্ত সরকার কাজ করতে পারে। যদি এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংসদ সদস্য বের করে নেয়। তাহলে সরকার অথবা মন্ত্রিসভা সত্তায় থাকতে পারে না। সংসদ সদস্য, আমাদের মন্ত্রিসভার উপরে বিশ্বাস নেই করে অবিশ্বাস প্রস্তাব প্রস্তুত করতে পারে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই প্রস্তাব পারিত হলে পরে মন্ত্রিসভাকে ত্যাগপত্র দেওয়া লাগো।

**বলোতো দেখি ?**

সংসদ সদস্যাকে চর্চায় প্রভাবী রূপে সহভাগী হওয়ার জন্য কি করা দরকার।

কার্যকারী মন্ডলের নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক আমলাতন্ত্র হয়। আমলাতন্ত্রের সংরচনার অধ্যয়ন আমরা যষ্ঠ পাঠে করবো।

## অনুশীলনী

**১. নিম্ন বিকল্পগুলি থেকে উপযুক্ত বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পুনরায় লেখো।**

(১) ভারতের নির্বাহী ক্ষমতা .......... কাছে থাকে।
(রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান)

(২) রাষ্ট্রপতির (কার্যকাল) মেয়াদ ......... বছরের থাকে।
(তিন, চার, পাঁচ)

(৩) মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব ......... করে।
(দল প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি)

**২. চেনো এবং লেখো।**

(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার ভারতের যে মন্ডলে সমাবেশ হয়। ঐ মন্ডলের নাম ----।

(২) অধিবেশন সত্র (কাল) দুপুর ১২ টা সময় কে এই নামে জানা যায় ------।

**৩. নিম্ন সংকল্পনা নিজের শব্দে লেখো।**

(১) অভিশংসন প্রক্রিয়া (২) অবিশ্বাস প্রস্তাব
(৩) জাম্বো মন্ত্রিসভা।

**৪. সংক্ষেপে উত্তর লেখো।**

(১) মন্ত্রিসভার কাজ স্পষ্ট করো।

(২) সংসদ মন্ত্রিসভার উপরে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখে।

**৫. নিম্ন সংকল্পনাচিত্র পূর্ণ করো।**

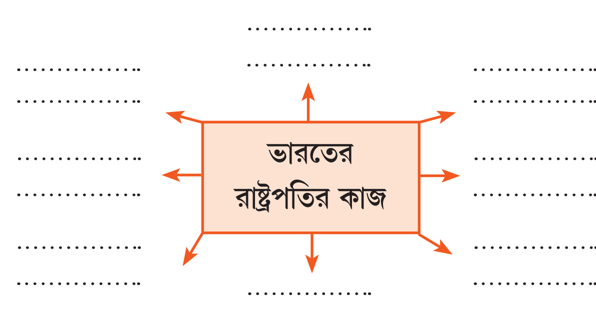


**উপক্রম**

(১) যদি তুমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাও তাহলে তুমি কি কাজের প্রাথমিকতা (আদর্শতা) দেবে, তার প্রাথমিকতার আধারে সূচী তৈরি করে শ্রেনীতে প্রস্তুত করো।

(২) ভারতের রাষ্ট্রপতির চিত্র এবং তথ্য সংগ্রহ করো।

# ৪. ভারতের বিচার বিভাগ

আইনসভা এবং নির্বাহী মন্ডলের (সাংস্থার) সাথে বিচার বিভাগ, ও শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ। আইনসভা দ্বারা আইন প্রনয়ন করো নির্বাহী মন্ডল এটি বাস্তবায়ন করে এবং বিচার বিভাগ, ন্যায়বিচার প্রদানের কাজ সম্পাদন করে। প্রস্তুত পাঠে আমাদের বিচার বিভাগ দ্বারা ন্যায়বিচার কিভাবে করা হয়। যাতে সমাজের অন্তর্নিহিত অন্যায় দূর করে সামাজিক স্বাস্থ্য অর্জিত হয়, ইহার উপর বিচার পরামর্শ করবো। তৎপূর্বে আমাদের ন্যায়বিচারের আবশ্যক কেন হয়, এই সম্বন্ধে জেনে নেবো।

ব্যক্তি-ব্যক্তির মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি শ্রদ্ধা মান্যতা সংস্কৃতি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একে-অপরের প্রতি সহনশিলতা রাখলে কোনো সংঘর্ষ হয় না। কিন্তু মত ভিন্নতা খুব বেশী বেড়ে যায় তখন তা সংঘর্ষের সৃষ্টি করে এবং এমন সময় নিরপেক্ষ ভাবে সমাধানের জন্য আইনের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

- ব্যক্তি এবং শাসন প্রতিষ্ঠানের (সংস্থা) তে হিত সম্বন্ধীদের নিয়ে সংঘর্ষ হতে পারে। যখন লোকেদের শাসন ব্যবস্থা অন্যায়কারক মনে হয়, তখন তাহারা ওদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চাইতে পারে।
- শাসন বা সরকার সংবিধানে বর্নিত সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার এই উদ্দেশ্যগুলি প্রত্যক্ষরুপে ব্যবহারে আনার জন্য চেষ্টা করে। তদরুপ ন্যায় ব্যবস্থা ও কিছু নির্ণয় দ্বারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সরকারকে সমর্থন করতে পারে। সমাজের দুর্বল শ্রেনীর লোক, মহিলা, বালক-বালিকা, শিশু, অপঙ্গ এবং তৃতীয় পন্থী (transgender) আদি সামাজিক শ্রেনীকে মুল স্রোতে আনার জন্য আদালত সাহায্য করতে পারে।
- স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায় এবং গনতন্ত্রের সুবিধা, যখন সাধারন মানুষরা পায়, তখন গনতন্ত্রের ব্যাপকতা ও গভীরতা আরো বেড়ে যায়। গনতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য এটি প্রয়োজন।
- আইনের অধিপত্য বিচার বিভাগ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। ধনী-দরিদ্র, উন্নত-অবন্নত নারী-পুরুষ এই সকলের জন্য আইন সমান থাকে। তা ন্যায়দান থেকে স্পষ্ট হয়।
- ন্যায়বিচার নাগরীকদের অধিকারের রক্ষা করে। আইন অনুসারে বিরোধ নিস্পত্তি করা হয়। এবং কোনো গট, বা ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারেন দমন/ জবরদস্তি নীতি অথবা হুকুমশাহী নীতি নির্মান হতে প্রতিবন্ধ হবে।

**ন্যায় মন্ডলের গঠন :** ভারত একটি সংঘরাজ্য দেশ। কেন্দ্রশাসন এবং রাজ্য শাসনের স্বতন্ত্র আইনসভা এবং নির্বাহী কার্যকারী মন্ডল রয়েছে। কিন্তু বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ দেশের জন্য একটি রয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য এমন কোনো স্বাধীন বিভাগ নেই। এর অর্থ ভারতের বিচার বিভাগের স্বরুপ একইরকম। এই ন্যায় ব্যবস্থার সর্ব উচ্চ স্তরে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (সুপ্রিমকোট রয়েছে। এই কোর্ট সুপ্রিম কোর্টে পরে পরবর্তী স্তরে রয়েছে উচ্চতম আদালত (হাইকোট) উচ্চতম আদালতের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে জেল আদালত এবং এর পর দুইয়াম আদালত।

**উচ্চতম আদালত (সুপ্রিমকোর্ট) :** ভারতের প্রধান বিচারপতি হলেন সর্বোচ্চ আদালতের প্রমুখ। ভারতের প্রধানবিচারপতি ও অন্য বিচারপতির নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি দ্বারা করা হয়। সর্বোচ্চ আদালতের সব থেকে জেষ্ঠ বিচারপতিকে ‘প্রধান বিচারপতির’ পদে নিযুক্ত করার নিয়ম বা আইন করা হয়েছে।

ন্যায় বিচারের কাজ কারুর চাপে পড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। ন্যায়বিচারক নির্ভয়ে ন্যায়মত বিচার করবে, এই জন্য বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নলিখিত বিধান করেছে-

- ন্যায়বিচার পতির যোগ্যতা ও শর্ত সংবিধানে স্পষ্ট করা হয়েছে। এসব পদের জন্য কুশল

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত (সুপ্রিমকোর্ট) - নতুন দিল্লী

দক্ষতা উচ্চ আদালতের বিচার পতির পদ অথবা অ্যাডভোকেটের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

- ন্যায়বিচারপতির নিযুক্তি রাষ্ট্রপতি মহাশয় করেন। এর জন্য রাজনৈতিক চাপ থেকে দুরে থাকা যাবে।
- বিচারপতির সেবাকাল পদসিদ্ধ করা হয়। সাধারন কারনের জন্য বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাকে পদ থেকে অবসারন করা যাবে না। সর্বোচ্চ আদালতের ন্যায় বিচারপতির আয়ু ৬৫ বৎসর পূর্ন হওয়ার পর এবং উচ্চ-আদালতের ন্যায়বিচারকের আয়ু ৬২ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সেবা নিবৃত্তি দেওয়া হয়।
- ন্যায় বিচারকদের বেতন ভারতের অর্জিত বিত্ত থেকে দেওয়া হয়। এবং ওই বিষয়ে সংসদে আলোচনা করা হয় না।
- বিচারকদের কাজ এবং সিদ্ধান্তের ব্যক্তিগতভাবে আালোচনা করা যাবে না। আদালতের অবমাননাকে একটি অপরাধ বলে গন্য করা হয়। এবং এর জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। এই বিধানের জন্য অনুচিৎ আলোচনা থেকে বিচারক গন সংরক্ষণ পায় ও সাথে-সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় থাকে।
- ন্যায়বিচারপতির আচরন সম্বন্ধে সংসদে আলোচনা করতে পারবে না। এবং বিচার পতিকে এই পদ থেকে বরখস্ত করা এবং এদের উপর মহাঅভিযোগ পরিচালনা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

**বিচার আদলতের সক্রিয়তা :** আদালতে কোনো অভিযোগ আসলে, তা আদালত দ্বারা সমাধান করা হয়, এই ধরনের আদালতের বিষয়ে পারস্পারিক ছবি রয়েছে। গত কয়েক বছরদশক আদালতের ছবি সক্রিয় হয়েছে। এর অর্থ হলো আদালত বর্তমান সংবিধানে অর্পিত ন্যায়বিচার, সমতার মতো উদ্দেশ্য পুরন করার জন্য ভূমিকা পালন করে। সমাজের দুর্বল শ্রেনী, মহিলা, আদিবাসী, শ্রমিক, কৃষক এবং শিশুদের আইন দ্বারা সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা আইনের আদালত দ্বারা করা হয়েছে। এর জন্য জনকল্যাণ হিতার্থে মামলার ভুমিকার গুরুত্বপুর্ণ হয়েছে।

**উচ্চতম আদালতের (Suprim Court) কার্যাবলী :**

* সংঘরাজ্যের আদালতের ভূমিকা হল কেন্দ্রশাসন ও গঠনকারী রাজ্য, ঘটক রাজ্য ও ঘটক রাজ্য, কেন্দ্রশাসন ও ঘটক রাজ্যের মধ্যে বিরোধগুলির সমাধান বা মিমাংশা করে দেওয়া।
* নাগরিকের মৌলিক অধিকারের রক্ষা করার জন্য আদেশ প্রদান করা।
* কনিষ্ঠ আদালত দ্বারা প্রদত্ত করা সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করা ।
* রাষ্ট্রপতি সার্বজনিক দৃষ্টিতে যখন গুরুত্বপুর্ণ কোনো প্রশ্নের সাংবিধানিক পরামর্শ চান তখন তাকে পরামর্শ দেওয়া।

**বলো দেখি ?**

রাষ্ট্রপতি কোনো গুরুত্বপুর্ণ সর্বজনিক প্রশ্নের উপর উচ্চতম আদালতের পরামর্শ কেনো চায় ?

**অনুচ্ছেদ পড়ো এবং লেখো।**

**আদালতের পর্যালোচনা :** উচ্চতম আদালতের উপর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। সংবিধানের সুরক্ষা দেওয়া। সংবিধান দেশের মৌলিক আইন, এটি তোমরা জানো। এই আইনের লঙ্ঘন হবে বা এর বিরুদ্ধে সংসদ আইন তৈরী করতে পারে না। নির্বাহী মন্ডলের প্রত্যেকটি নীতি ও কর্ম অবশ্যই, সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা প্রয়োজন। সংসদের কোনো আইন বা নির্বাহী মন্ডলের কোনো কাজ সংবিধানের বিধান লঙ্ঘন করলে আদলত সেই কাজটিকে অসাংবিধানিক বা অযোগ্য আইন মনে করে বরখস্ত করে। আদালতের এই অধিকারকে পর্যালোচনার অধিকার বলা হয়।

- আদালতের এই অধিকার হওয়া উচিৎ কি?

**এই উদাহরন দেখো।**

নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আদালত তাদের সম্পত্তি এবং আয় তার সাথে শিক্ষার পাত্রতা এই বিষয়ের তথ্য শপথপত্র দ্বারা দিতে বলেছিলো। প্রার্থীদের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ভোটদাতা যেন ভোউ দিতে পারে, এটাই ছিল তার পেছনের উদ্দেশ্য। আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরো পারদর্শকতা করার চেষ্টা নয় কি?

এই বিষয়ে আদালতের অন্য কোনো আদেশ আছে কি? এই বিষয়ে তথ্য জেনে নাও।

জনকল্যাণ মামলা কথার অর্থ সার্বজনিক প্রশ্ন সমাধান করার জন্য প্রচেষ্টায় থাকা নাগরিক সামাজিক সংস্থা বা বেসরকারী সংস্থাগুলি সমগ্র জনগনের পক্ষে আদালতে দায়ের করা আবেদনকে জনস্বার্থ মামলা বলা হয়। আদালত এর উপর বিবেচনা করে নির্ণয় দেয়।

**উচ্চ আদালত :** ভারতের কেন্দ্র শাসনের অধিন্যস্ত প্রতিটি ঘটক রাজ্যের জন্য একটি উচ্চ আদালত স্থাপন করার অধিকার সংসদকে (পার্লামেন্ট) দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ২৪ টি উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) রয়েছে।

উচ্চ আদালতে একজন করে প্রধান বিচারপতি এবং অন্য কিছু বিচারপতি রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি উচ্চ আদালতের সকল বিচারপতির নিযুক্তি করেন।

**করে দেখো।**

মুম্বই উচ্চ আদালত দুটিরাজ্য মহারাষ্ট্র এবং গোবা ও দাদর নগর হবেলী এবং দ্বীপদামন কেন্দ্রশাশিত প্রদেশে রয়েছে। একাধিক রাজ্যের জন্য কাজ করছে এমন উচ্চ আদালতের দুটি উদাহরন খোঁজ করো।

**উচ্চ আদালতের কার্যাবলী**

- আমাদের অধিকার ক্ষেত্রের অধিনস্ত অধস্তন আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ রাখার তত্ত্বধান অধিকার রয়েছে।
- মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য আদেশ দেওয়ার অধিকার রয়েছে।
- জেলা আদালতের ন্যায় বিচারপতির নিযুক্ত করার জন্য রাজ্যপাল (গভর্নর) উচ্চ আদালতের নিকট পরামর্শ করেন।

**জেলা এবং অধস্তান (দুইয়াম) আদালত :** জনগন সর্বদা জেলা এবং তহশিল স্তরের আদালতে সাথে সম্পর্ক রাখে। প্রতিটি জেলা আদালতে একজন জেলা ন্যায়বিচারক রয়েছে।

**ভারতের আইন ব্যবস্থার শাখা :** আইন ব্যবস্থার প্রধান দুটি শাখা রয়েছে।

(১) দেওয়ানী আইন (২) ফৌজদারী আইন

**দেওয়ানী আইন :** জনগনের অধিকার বাধা বা লঙ্ঘন করা এমন বিরোধ এই আইনের অধিনে থাকে।

উদাহরন - জমি সমন্ধে বিরোধ ভাড়া ইজারা বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি সম্বন্ধিত আদালতের সামনে একটি পিটিশন দায়ের করার পর আদালত তারউপর নির্ণয় দিতে পারে।

**ফৌজদারী আইন :** গুরুতর অথবা ফৌজদারী আইনের ভিত্তিতে সমাধান করা হয়। উদা- যেমন চুরি অপরাধ, ডাকাতি, যৌতুকের জন্য শারিরীক নির্যাতন হত্যা করা ইত্যাদি। এসব অপরাধের জন্য সর্বপ্রথম পুলিশের কাছে তথ্য প্রতিবেদন (এফআয়আর) দায়ের করা হয়। পুলিশ তাহা তদন্ত করে, এবং তারপর আদালতে মামলা দায়ের করে। দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তির স্বরুপ কঠোর হয়ে দাড়ায়।

ভারতের বিচার ব্যবস্থা অগ্রগতি হওয়ার বিরাট অবদান রয়েছে। সাধারন মানুষের মনে বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্তার অনুভূতি রয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংঘরাজ্যের (ইউনিয়ন) এবং সংবিধানের সংরক্ষণ ভারতের বিচার বিভাগ করেছে। ভারতীয় গনতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে আদালতের বিরাট অবদান রয়েছে।

## অনুশীলনী

**১. দেওয়া বিকল্প থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পূনরায় লেখো।**

(১) আইনের নির্মিতি ............ করে।

(অ) বিচার বিভাগ (ব) মন্ত্রিমন্ডল

(ক) আইন সভা (ড) নির্বাহী মন্ডল

(২) সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতির নিযুক্তি ............ করে।

(অ) প্রধানমন্ত্রী (ব) রাষ্ট্রপতি

(ক) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (ড) প্রধানবিচারপতি

**২. নিচের সংকল্পনা স্পষ্ট করো।**

(১) আদালতের পর্যালোচনা

(২) জন স্বার্থ মামলা

**৩. টিপ্পনী (নোউ)/ মন্তব্য লেখো।**

(১) দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন

(২) আদালতের সক্রিয়তা

**৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখো।**

(১) সমাজে আইনের প্রয়োজন কেন হয় ?

(২) সর্বোচ্চ আদালতের কার্য ব্যাখ্যা করো।

(৩) ভারতের বিচার ব্যবস্থাকে স্বাধীনতা রাখার জন্য কি বিধান দেওয়া হয়েছে ?

**৫. নিম্নলিখিত তালিকা পূর্ণ করো।**

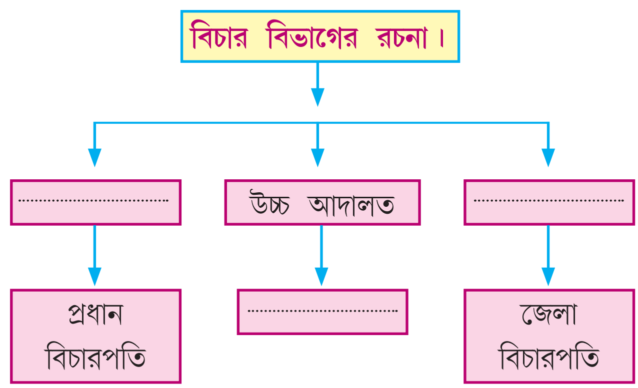


**উপক্রম**

(১) তোমার পাঠশালায় 'অভিরুপ বিচারালয়ের' আয়োজন করে বিভিন্ন জনস্বার্থে পি.আয়.এল. এর প্রশ্ন তৈরী করো ও অভিরুপ বিচারালয়ে জিজ্ঞাসা করো।

(২) শিক্ষকদের সাহায্যে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (FIR) কীভাবে দায়ের করবে, এই প্রক্রিয়া নিকটস্ত পুলিশ থনায় গিয়ে বুঝে নাও।

# ৫. রাজ্য সরকার

শেষের পাঠ পর্যন্ত আমরা কেন্দ্র সরকারের সংসদ এবং কার্যনির্বাহী মন্ডলের স্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্ত করেছি। ভারতের ঐক্যবদ্ধ ন্যায়পালিকার পরিচয় প্রাপ্ত করেছি। প্রস্তুত পাঠে আমরা অঙ্গ রাজ্য অথবা রাজ্য সরকার সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্ত করবো।

সংঘরাজ্য ব্যবস্থায় দুটি স্তরে শাসন সংস্থা কাজে রত থাকে। জাতীয় স্তরে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য স্তরে রাজ্য সরকার কাজ করে। ভারতে ২৮টি অঙ্গ রাজ্য রয়েছে এবং সেখানকার শাসন সেখানকার সরকার দ্বারা চালানো হয়।

**পার্শ্বভূমি :** ভারতের ভৌগোলিক বিস্তার অনেক বড় এবং লোকসংখ্যার স্বরূপও অনেক বড়। ভাষা, ধর্ম, প্রথা-ঐতিহ্য এবং প্রাদেশিক স্বরূপেও বিবিধতা, রয়েছে। এমন সময় একই অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্থান থেকে শাসন চালানো কঠিন হয়, এই কথা বিবেচনা করে সংবিধান ভারতের জন্য সংঘরাজ্য ব্যবস্থাকে স্বীকার করে। ভাষার ভিত্তিতে অঙ্গ রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী ভাষাভিত্তিক প্রান্ত (প্রদেশ) রচনা করা হয়।

ভারতের সমস্ত অঙ্গ রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার রাজনৈতিক স্বরূপ এক সমান। ব্যতিক্রম শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের। মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে আমরা অঙ্গ রাজ্যের শাসন সংস্থার স্বরূপ জেনে নেবো।

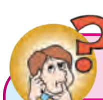

**তুমি জানো কি ?**

যদিও ভারতে ২৮টি অঙ্গ রাজ্য রয়েছে তবুও বিধান সভার সংখ্যা ৩১ টি কারন দিল্লী, পুদুচেরি এবং জম্মু ও কাশ্মীর এই কেন্দ্রশাসিত প্রদেশগুলিতে বিধান সভা অস্তিত্বে রয়েছে।

**রাজ্য সরকারের আইন সভা :** কেন্দ্রের সংসদের মতো রাজ্য স্তরে প্রতিটি রাজ্যের আইন সভা রয়েছে। মাত্র সাতটি রাজ্যের আইন সভা দুটি সদনের রয়েছে। ইহাতে মহারাষ্ট্রেরও সমাবেশ রয়েছে। আইন সভার সদস্যদেরকে বিধায়ক (MLA) বলা হয়।

**মহারাষ্ট্রের আইন সভা :** মহারাষ্ট্রে বিধান সভা এবং বিধান পরিষদ দুটি সদন রয়েছে।

বিধান ভবন, মুম্বাই

**বিধান সভা :** মহারাষ্ট্র আইন সভার প্রথম সদন এবং ইহার সদস্য সংখ্যা ২৮৮। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকায় রাজ্যপাল এই সমাজের একজন প্রতিনিধিকে বিধান সভায় নিযুক্ত করেন। অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাতির জন্য কিছু স্থান সংরক্ষিত থাকে। নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্রকে নির্বাচন ক্ষেত্রে বিভাজন (ভাগ) করা হয়েছে। প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে একজন প্রতিনিধির চয়ন করা হয়।

বিধান সভার কার্যকাল পাঁচ বছরের থাকে। ব্যাতিক্রমী পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই (পূর্বেই) নির্বাচন নেওয়া যেতে পারে।

যার বয়স ২৫ বছর পূর্ন হয়েছে। এইরূপ মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা যে কোন ভারতীয় নাগরিক। বিধান সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

**বিধান সভা অধ্যক্ষ :** বিধান সভার কার্যক্রম অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশ অনুযায়ী সঞ্চালিত হয়। নির্বাচনের পর বিধান সভার নবনির্বাচিত সদস্য নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে অধ্যক্ষ ও একজনকে উপাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত করে। সভাগৃহের

সংসদের কাজ সুশৃঙ্খলাভাবে পরিচালনা যাতে হয়, তাই প্রোগ্রামপত্রিকা তৈরি করা থেকে শুরু করে সংসদবিরুদ্ধ আচরনের জন্য সদস্যকে সংসদ থেকে বরখাস্ত করা পর্যন্ত অনেক কাজ অধ্যক্ষকে করতে হয়। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে এই সম্পূর্ণ দায়িত্বটি উপ অধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়।

মহারাষ্ট্রে বিধানসভার, বছরে অন্তত তিনটি অধিবেশন হয়। বাজেট ও বর্ষাকালীন অধিবেশন মুম্বাই এখানে অনুষ্ঠিত হয়, এবং শীতকালীন অধিবেশন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

**বিধান পরিষদ :** মহারাষ্ট্র বিধানসভার এটি দ্বিতীয় সদন যা পরোক্ষভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর দ্বারা নির্বাচিত করা হয়। মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদে ৭৮ জন সদস্য রয়েছে। এতে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবার মতো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের রাজ্যপাল নিয়োগ করেন এবং বাকি প্রতিনিধিরা বিধানসভা, স্থানীয় সংস্থা, শিক্ষক নির্বাচনী এলাকা এবং স্নাতক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন।

বিধান পরিষদ সম্পূর্ণ বরখাস্ত হয় না। প্রতি দুই বছর পর নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য অবসর গ্রহন করেন এবং একই সংখ্যক আসনের জন্য নির্বাচন করা হয়। বিধান পরিষদের কাজকর্ম বিধান পরিষদের সভাপতির নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপসভাপতি এই দায়িত্ব পালন করেন।

**মহারাষ্ট্রের কার্যকারী মন্ডল :** মহারাষ্ট্রের কার্যকারী মন্ডল রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা নিয়ে গঠিত হয়।

**রাজ্যপাল :** কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন রাষ্ট্রপতি হলেন নামধারী প্রধান, তেমনি রাজ্যপাল হল রাজ্যস্তরে নামধারী প্রধান। রাষ্ট্রপতি দ্বারা রাজ্যপালের নিযুক্তি করা হয়। তিনি যতদিন চান ততদিন পর্যন্ত তিনি পদে থাকতে পারবেন। রাজ্যপালেরও আইন বিষয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা (অধিকার) রয়েছে। যেমন- বিধানসভা এবং বিধান পরিষদ দ্বারা পাস করা বিলগুলি রাজ্যপালের স্বাক্ষরের পরে আইনে পাশ হয়। আইনসভার (বিধিমন্ডলের) অধিবেশন ডাকার অধিকার রাজ্যপালের প্রাপ্য থাকে। আইনসভার অধিবেশন না থাকা অবস্থায় যদি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়, তবে রাজ্যপাল এমন একটি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন।

**মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা :** যে দলে বিধানসভায় স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, সেই দলের নেতাকেই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর মতো মুখ্যমন্ত্রীও কার্যকারী প্রধান থাকে। রাজ্যের সম্পূর্ন শাসন রাজ্যপালের নামে পরিচালিত হয় কিন্তু সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সরকার পরিচালনা করে।

## মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলী

**মন্ত্রিসভা গঠন :** সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমানের পরে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথমে তার মন্ত্রিসভা গঠন করতে হয়। এই কাজটি চ্যালেঞ্জিং, কারন মন্ত্রিসভা আরও প্রতিনিধিওশীল হওয়ার জন্য সমস্ত অঞ্চল, বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্র থেকে (অনুমুচিত জাতি, অনুসুচিত জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী, মহিলা সংখ্যালঘু ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে কিছু দল একত্রিত হয়ে সরকার গঠন করে। এমন সময় সমস্ত সহযোগী দলকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার কঠিণ কাজটি মুখ্যমন্ত্রীকে সম্পাদন করতে হয়।

**বিভাগ বিতরন :** মন্ত্রিসভা গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিদের বিভাগ বিতরণ করেন। বিভাগ বিতরনের সময়ও মন্ত্রিদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক কৌশল, তাদের জনমত বোঝার ক্ষমতা, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ের বিবেচনা করতে হয়।

**বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় :** মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ হওয়ার কারনে একটি দক্ষ সরকার পরিচালনার অন্তিম দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর উপর থাকে। ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের মনোভাব না থাকলে তার প্রভাব

সরকারের কাজের উপর পড়ে। সেই কারনে বিভিন্ন বিভাগগুলির বিরোধ দূর করে সকল বিভাগ একই পথে কাজ করে কিনা সেদিকে মুখ্যমন্ত্রীকে নজর রাখতে হয়।

**রাজ্যের নেতৃত্ব :** প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে পরিচালনা করেন, একই ভাবে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পরিচালনা করেন। নিজের রাজ্যের স্বার্থ এবং তাদের সমস্যার কথা লক্ষ্য রেখে মুখ্যমন্ত্রী সেই অনুযায়ী নতুন নীতি তৈরি করেন। রাজ্যের লোকে মুখ্যমন্ত্রীকে 'আমাদের সমস্যার সমাধানকারী' মানুষ হিসেবে দেখে। মুখ্যমন্ত্রী সরকারের তরফে রাজ্যের সমস্যা সমাধানের আশ্বাসন দিলে তখন জনসাধারন মনে স্বস্তি পায়।

মহারাষ্ট্র রাজ্য ভারতের একটি প্রগতিশীল রাজ্য। শিক্ষা, শিল্প, সেবাক্ষেত্র, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে এগিয়ে আছে। আতঙ্কবাদি গতিবিধি এবং কিছু অংশে নকশাল আন্দোলন আমাদের নিজেদের রাজ্যের সম্মুখে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

## অনুশীলনী

**১. নিম্নলিখিত বিকল্পগুলি থেকে উপযুক্ত বিকল্পটি নির্বাচন করে বাক্যটি পুনরায় লেখো।**

(১) মহারাষ্ট বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ........... এখানে অনুষ্ঠিত হয়।
(অ) মুম্বাই (ব) নাগপূর
(ক) পুনে (ড) ঔরঙ্গাবাদ

(২) রাজ্যপালের নিযুক্ত ......... দ্বারা হয়।
(অ) মুখ্যমন্ত্রী (ব) প্রধানমন্ত্রী
(ক) রাষ্ট্রপতি (ড) প্রধান বিচারপতি

(৩) রাজ্য আইনসভার অধিবেশন ডাকার অধিকার ............ এর প্রাপ্য থাকে।
(অ) মুখ্যমন্ত্রী (ব) রাজ্যপাল
(ক) রাষ্ট্রপতি (ড) সভাপতি

**২. ছকটি পূর্ন করো।**

| অ. ক্র. | সভাগৃত | অফিস | সদস্য সংখ্যা | নির্বাচনের প্রকৃতি | প্রধান |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বিধানসভা | | | | |
| ২. | বিধান পরিষদ | | | | |

**৩. টিপ্পনী (নোউ) লেখো।**

(১) রাজ্যপাল (২) মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলী

**৪. নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর লেখো।**

(১) বিধানসভা সভাপতির কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো।
(২) সংবিধান ভারতের জন্য কেন্দ্র শাসিত প্রদেশকে কেনো গ্রহন করেছে?
(৩) বিভাগ বিতরনের সময় মুখ্যমন্ত্রীকে কী-কী বিষয়ে বিবেচনা করতে হয়?

**উপক্রম**

মহারাষ্ট্র সরকারের অধিকৃত অফিসিয়াল বেবসাইটে গিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রী এবং তাদের বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য অর্জন করো।

# ৬. প্রশাসনিক সেবা

জেলা অধিকারী জমাবন্দির নির্দেশ দেন।

নগর নিগম আয়ুক্ত আয়-ব্যয়ের শীট পেশ করে।

অর্থ সচিব পদত্যাগ করলেন।

বিভাগীয় আয়ুক্ত রাজস্ব পর্যালোচনা করবেন।

জেলা অধিকারী, নগর নিগম আয়ুক্ত, অর্থ সচিব, বিভাগীয় আয়ুক্ত এই পদগুলি উপরের তালিকায় উল্লেখ করা আছে। এরাই সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক অধিকারী। তারা কি করেন? এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোমার মনে হয়েছে?

কার্যনির্বাহী মন্ডলের ভূমিকা স্পষ্ট করার সময় আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভা নতুন করে এবং নীতি নির্ধারন করে। সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করে এবং কার্যনির্বাহী মন্ডলের নিয়ন্ত্রনে কাজ করে এমন প্রশাসকীয় ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক সেবা বলা হয়। বর্তমান পাঠে আমরা প্রশাসনিক সেবার গুরুত্ব বিষয়ে অধ্যয়ন করবো।

যে কোনো দেশের শাসন প্রতিষ্ঠানকে মূলত দুই প্রকারের কাজ করতে হয়।

(১) দেশে বিদেশী আক্রমতা থেকে এবং আন্তরিক সুরক্ষা বিষয়ের বিপদ থেকে রক্ষা করে নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করা ।

(২) নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সুগম (সুব্যবস্থিত) করা, যাতে তারা নিজেদের এবং সমাজের জন্য উন্নতি করতে পারে।

এর মধ্যে প্রথম কাজের জন্য দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সর্বদা সজ্জিত (প্রস্তুত) থাকে। এই সেবাগুলি অন্তর্গত সুরক্ষার জন্য নাগরী সেবাকে সাহায্য করে। এই সেবাগুলিকেই আমরা 'সৈন্য সেবা' বলি। দ্বিতীয় কাজের জন্য প্রশাসকিয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়, যাকে আমরা 'প্রশাসনিক সেবা' বলি। সরকারি কর্মচারীদের এই ব্যবস্থাকে আমরা চাকরিজীবী প্রশাসনিক সেবা বলি।

সংসদীয় গনতন্ত্রে প্রশাসনিক দায়িত্ব জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন বিভাগ থেকে সরকারি কাজ সম্পন্ন হয়। প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন মন্ত্রী থাকেন, তিনি সেই বিভাগের রাজনৈতিক প্রধান জনপ্রতিনিধি হওয়ার কারণে মন্ত্রীদের নিজ বিভাগের প্রশাসন জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে পরিচালনা করা প্রয়োজন। মন্ত্রী হয়তো তার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নাও হতে পারে, কিন্তু ব্যাপক জনস্বার্থ কি হয়? এর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মন্ত্রীর বিভাগের সচিব তাকে যথাযথ পরামর্শ দেন। এই সচিবদের প্রশাসনিক সেবা দ্বারা নিয়োগ করা হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় জনগনের ইচ্ছা এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা উভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় রাখা হয়।

## প্রশাসনিক সেবার স্বরূপ

- **স্থায়ী ব্যবস্থা :** রাজস্ব (কর) আদায় করা, পরিবেশ রক্ষা করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করার- মতো কাজগুলি নিরন্তরভাবে করা হয়। যার কারনে এর স্বারূপ স্থায়ী। প্রতি নির্বাচনের পর একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসতে পারে, কিন্তু তার, নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসকিয় কর্মচারী পরিবর্তন হয় না কারন এর প্রকৃতি স্থায়ী স্বারূপ।

- **রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ :** প্রশাসকিয় কর্মচারী সবসময় রাজনীতি থেকে দূরে থাকে (নিরপেক্ষ থাকে)। এর অর্থ, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকুক না কেনো, প্রশাসকীয় কর্মচারীদের

সেই সরকারের নীতি পূর্ণ দক্ষতা ও সততার সাথে বাস্তবায়ন করা উচিৎ। প্রশাসনিক কর্মচারীদের কোন রাজনৈতিক ভূমিকা বা রাজনৈতিক মতামতে কাজ করা উচিত নয়। নির্বাচন হেরে গেলে এক দল ক্ষমতা থেকে দূরে সরে গিয়ে আরেক দল ক্ষমতায় এসে আগের সরকারের কিছু নীতি পরিবর্তন করতে পারে। এমতবস্থায় প্রশাসনিক কর্মচারীদের কর্তব্য যে একনিষ্ঠ হয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করা।

• **বেনামী :** বেনামীর অর্থ যে কোন নীতির সফলতা - অসফলতার জন্য সরাসরী প্রশাসনিক কর্মচারীদের দায়ী না করে তাহা বেনামী রাখা। মন্ত্রীদের দায়িত্ব তাদের বিভাগের প্রশাসন পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা। কোন বিভাগের অদক্ষতার জন্য মন্ত্রীদের দায়ী করা হয়। সংসদ ওই বিভাগের অনিয়মের জন্য ওই বিভাগের মন্ত্রীদের দায়ী করে। এক্ষেত্রে মন্ত্রীরা নিজেরাই দায়িত্ব গ্রহন করে এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের রক্ষা করে।

## ভারতে প্রশাসনিক কর্মচারীর মহত্ব

ভারতে প্রশাসনিক কর্মচারীর সংরচনা খুবই বিস্তৃত এবং জটিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে, তাহা বাস্তবায়নে প্রভাবী রুপে কার্যকর। আজকে আমরা যে অনেক ভালো সামাজিক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি তার একটি কারন হল ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মচারীর মাধ্যমে সেগুলিকে জনগনের কাছে নিয়ে এসেছে। এতে ভারতীয় প্রশাসনিকদের বড় যোগদান। প্রশাসনিক কর্মচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্থিতিশীলতা দেয়। জল সরবরাহ, সার্বজনিক স্বচ্ছতা, পরিবহ, স্বাস্থ্য, কৃষি উন্নতি, প্রদুষন প্রতিরোধ এবং আরও অনেক পরিষেবা একটানা ক্রমাগতে আমরা পেয়ে থাকি। এটি সমাজের দৈনন্দিন জীবনে স্থিতিশীলতা দেয়।

দ্বিতীয়তা, প্রশাসনিক কর্মচারী সামাজিক পরিবর্তনের একটি মহত্বপূর্ণ সাধন। স্ত্রীদের ক্ষমতায়ন, শিশুদের সুরক্ষা, সমাজের দুর্বল প্রভৃতি বিষয়ে সরকার যে আইন প্রনয়ন করে, তাকে প্রত্যক্ষরুপে আনার কাজটি করে থাকে প্রশাসনিক কর্মচারী।

নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসে। সামাজিক গনতন্ত্রে প্রশাসনিক কর্মচারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষিত স্থানের নীতির কারনে অনেক অবহেলিত সামাজিক ঘটক মূল স্রোতে যুক্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় তাদের সহভাগে বৃদ্ধি হয়েছে। সমাজের গনতন্ত্রী করনের জন্য প্রগতিশীল আইন ও নীতির প্রয়োজনীয়তার সাথে কার্যকুশল প্রশাসনিক কর্মচারী প্রয়োজন।

**প্রশাসনিক পরিষেবাগুলির প্রকার :** ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবাগুলি তিন প্রকার রয়েছে।

**(১) ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা :** এটি ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা (IAS), ভারতীয় পুলিশ পরিষেবা (IPS), ভারতীয় বন পরিষেবা (IFS) এই পরিষেরা অন্তর্ভূক্ত।

**(২) কেন্দ্রীয় পরিষেবা :** এই পরিষেবাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। ভারতীয় বিদেশ পরিষেবা (IFS), ভারতীয় রাজস্ব পরিষেবা (IRS) এই পরিষেবাগুলি কেন্দ্রীয় পরিষেবাগুলির অন্তর্ভূক্ত।

**(৩) রাজ্য পরিষেবা :** এই পরিষেবাগুলি রাজ্য সরকারের অধীনে। উপজেলাধিকারী, গট বিকাস অধিকারী, তহসিলাদার ইত্যাদি প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়।

ভারতীয় সংবিধানে প্রশাসনিক কর্মচারীদের নির্বাচন যোগ্যতা এবং কার্যকুশলতার ভিত্তিতে করার জন্য সংঘ পরিষেবা আয়োগের মতো একটি স্বাধীন ব্যবস্থা তৈরী করেছে। সংঘ লোকসেবা আয়োগ (UPSC) ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা এবং কেন্দ্রীয় পরিষেবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচন করে এবং সরকার দ্বারা তাদের নিযুক্ত করা হয়। মহারাষ্ট্র লোকসেবা আয়োগ (MPSC) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মহারাষ্ট্র প্রশাসনিক পরিষেবারজন্য

প্রার্থীদের নির্বাচন করে এবং তাদের নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে।

প্রশাসনিক কর্মচারী এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সমাজের সম্পূর্ণ অংশকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, অনুসূচিত জাতি, (তফসিলিজাতি) এবং অনুসূচিত জনজাতি, মহিলা, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী ও বিকলাঙ্গদের সংরক্ষনের মাধ্যমে পরিষেবাগুলিতে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সামাজিক বৈষম্যের কারনে দুর্বল ঘটক প্রশাসনিক পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য এই বিধান করা হয়েছে।

**মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্মচারী :** মন্ত্রী এবং তার বিভাগের কর্মচারী অথবা সচিব, উপসচিব এই পদে কর্মরত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এসব বিভাগের কর্মদক্ষতানির্ভর করে। মন্ত্রীরা তাদের বিভাগের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু প্রশাসনিক কর্মচারিরা এসব সিদ্ধান্ত নিতে তাদের সব ধরনের তথ্য বা জানকারী দেয়। প্রশাসনিক কর্মচারীদের অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীর তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। কোন প্রকল্পের জন্য কত আর্থিক ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা প্রশাসনিক কর্মচারী বলতে পারে। তাদের নীতির সাফল্য - ব্যর্থতা সম্পর্কে তথ্য জানা থাকে। তাই মন্ত্রীরাও প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপর নির্ভর থাকে। যদি মন্ত্রী এই প্রশাসনিক কর্মচারীদের সঙ্গে আস্থা, পারস্পারিক বিশ্বাস এবং আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক থাকলে তাদের বিভাগের প্রশাসন পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে চলতে পারে।

## অনুশীলনী

**১. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সত্য বা অসত্য পড়ে পুনরায় লেখ।**

(১) সংসদীয় লোকতন্ত্রে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকে।

(২) সংঘ লোক সেবা আয়োগ (UPSC) মহারাষ্ট্র প্রশাসনিক পরিষেবার জন্য প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচন করে ।

**২. নিম্ন লিখিত বক্তব্যগুলো কারনসহ ব্যাখ্যা কর।**

(১) প্রশাসনিক সেবায় সংরক্ষিত স্থানের নীতি আছে।

(২) প্রশাসনিক কর্মচারীদের রাজনৈতিকের দিক থেকে নিরপক্ষ থাকা প্রয়োজন কেন ?

**৩. নিম্নলিখিত প্রশ্নের ২৫ থেকে ৩০ শব্দে উত্তর দাও।**

(১) বিভাগের কার্যকৃশলতা পরিচালনার জন্য মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের ভূমিকা স্পষ্ট করো।

(২) সরকারী কর্মচারী থেকে কীভাবে রাজ্য প্রশাসন স্থিতিশীলতা প্রাপ্ত করে, তা স্পষ্ট করো।

**৪. নিম্নলিখিত সংকল্পনা ছবি পূর্ন করো**

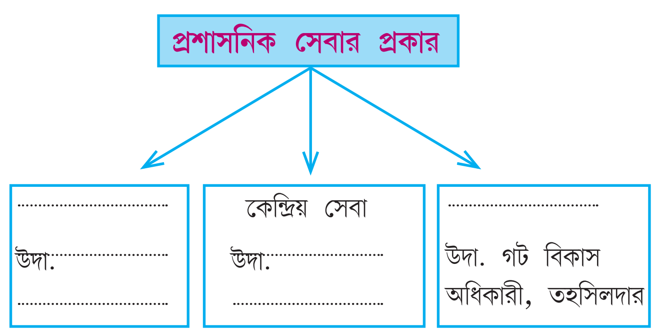


**৫. প্রশাসনিক সেবা স্পষ্ট করো ।**

**উপক্রম**

তোমার অঞ্চলের প্রশাসনিক সেবার কর্মরত একজন অধিকারীর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য একটি প্রশ্নাবলী তৈরী করো এবং সাক্ষাৎকার করো।

# छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.

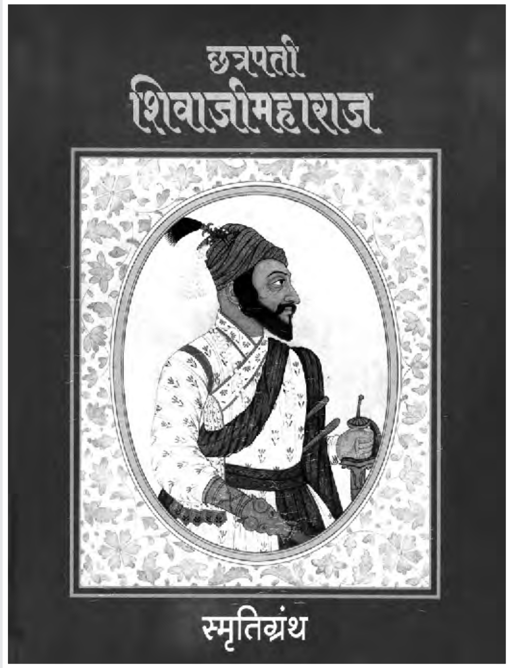


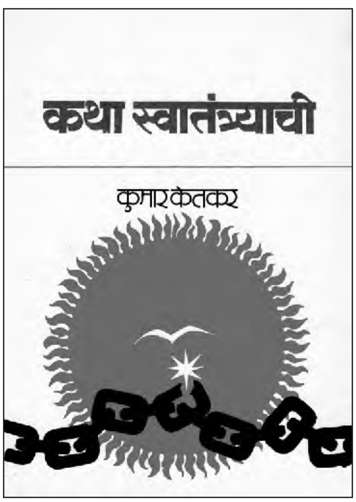


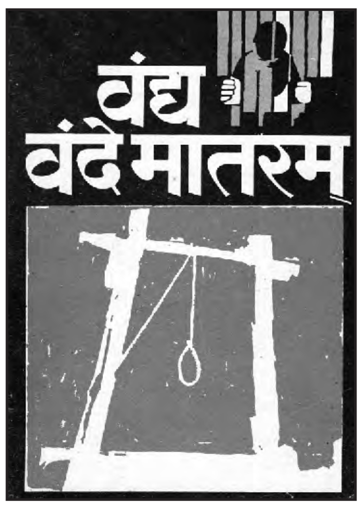

- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

**पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेतस्थळावर भेट द्या.**

**साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.**

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পূণে।

इतिहास व नागरिकशास्त्र इ.८ वी (बंगाली माध्यम)

₹ 42.00